ফিরে দেখা

পাণ্ডুলিপি
২৬/২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৬৪

মূল প্রাপ্তিস্থান ঃ
কমলা প্রকাশনী
১৪, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য
অলংকরণ ঃ উদয় চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৯১ □ প্রকাশক ঃ মানস ভট্টাচার্য, প্রযত্নে ঃ মাণিক দাস, ২৬/২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ □ মুদ্রণে ঃ নির্মলা প্রেস, দুলালচন্দ্র ঘোষ, ৩২/ই জয় মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৫ □ প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স, কলকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীমতী প্রগতি ভট্টাচার্য-কে

শীতকালের রাত। প্রায় এগারটা বাজে। শহরতলির একটা ষ্টেশনে ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। দিনের বেলা হ'লে অনেক লোক ওঠা নামা করত। শুধু দিনের বেলা কেন রাতের দিকেও অফিস ফেরত লোক যখন নামে তখন ষ্টেশন চত্ত্বরে ভিড় হয়ে যায়। কিন্তু ক'দিন হোল শীতটা একটু জাঁকিয়ে পড়েছে। সাথে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। তাই ট্রেনে ওঠার লোক প্রায় ছিলই না। যে কয় জন নামল, নেমেই গরম-কাপড়ে কান-মাথা পেচিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটা শুরু করে দিল। বাড়ি ফেরার তাগাদা। দু-এক মিনিটের মধ্যে ষ্টেশন চত্ত্বর ফাঁকা হয়ে গেল। অভীকের কোন ব্যস্ততা নেই। বাড়ি ফিরতে ওর প্রায়ই রাত হয়। তবে আজকাল ইচ্ছে করেই একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফিরছে। মনটা ভাল নেই।

ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। সকাল থেকে সব সময়ই তো ব্যস্ততা। তাই রাতে বাড়ি ফেরার সময় অভীক কোন ব্যস্ততা দেখায় না। কাঁধে ঝোলানো একটা শান্তিনিকেতনী চটের ব্যাগ। তাতে যত রাজ্যের কাগজপত্র। বই আর একটা মাফ্লার'। শীতকাল বলে এটা আছে। গ্রীষ্মকাল হলে তার বদলে হয়তো আর একটা বই থাকত। সেই সকালে আট-টা সাড়েআটার মধ্যে নাকে মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর প্রথমেই পার্টি অফিসে হাজিরা। সেখান থেকে কাজ বুঝে নিয়ে কখনও গ্রূপ মিটিং' কখনো 'মাস্ মিটিং' যখন যা নির্দেশ আসে পালন করে। তারপর কলেজে ছাত্র পড়ানো। যে দিন রাতে পার্টির কোন প্রোগ্রাম থাকে না সেদিন কলেজে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে। কিছু কাজকর্ম করে। তখন পড়াশোনায় এমন ডুবে যায় যে হুস থাকে না। পিয়ন এসে বলে, 'স্যার, রাত হয়েছে। এবার লাইব্রেরী বন্ধ করব।'

অভীক লেখা বন্ধ করে দেখে একা সে লাইব্রেরীতে বসে। বলে 'উঠছি। তুমি জানালাগুলো বন্ধ করে লাইটগুলো 'অফ' করতে থাকো আমি উঠছি।'

রাত করে বাড়ি ফিরলেও ইদানীং ইচ্ছে করেই একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফিরছে। ষ্টেশন থেকে বাড়িটা দশ মিনিটের পথও নয়। কিন্তু অভীকের মনে হচ্ছে সে যেন হাঁটছে তো হাঁটছেই। কিছুদিন হোল সুমনকে নিয়ে মল্লিকা চলে গেছে। বাড়িটা তাই বড় খালি খালি লাগে। সুমন সবে সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। ছেলের প্রতি অভীকের দুর্বলতা একটু বেশিই ছিল। তাই ওর মুখ চেয়েই অভীক চেষ্টা করেছিল মল্লিকার সাথে এ্যাড্যাস্ট করে চলার। কিন্তু হোল না। মল্লিকা শেষ পর্য্যন্ত রাগ করেই সুমনকে নিয়ে চলে গেল।

অভীকের জেদ মাথা নত করে স্ত্রীকে ফেরানোর চেষ্টা করবে না। সেই ধাতুতে সে গড়া নয়। শুনেছে মল্লিকা বাপের বাড়িতে ওঠে নি। একটা ' রেন্টেড্ এ্যাপার্টমেন্টে' ছেলেকে নিয়ে একাই আছে। হয়তো শীঘ্রই ডাইভোর্সের মামলা স্যুট' করবে।

অভীক আর মল্লিকার সম্পর্ক তলে তলে যে এতটা খারাপ হয়ে গেছে মা বিনোদা দেবী তা আন্দাজ করতে পারেন নি। ভেবেছেন বৌমা মাঝে মাঝে তো বাপের বাড়ি বা বোনের বাড়ি যায় সেই রকমই হয়তো গেছে কয়েকদিনের জন্য। আবার ফিরে আসবে। কিন্তু কয়েক মাস হয়ে গেল এত দিনেও না আসাতে তিনি মাঝে মাঝেই অভীককে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁরে, অভী, বৌমা তো খোকাকে নিয়ে অনেকদিন হোল গেছে। এত দিনেও ফিরে এলো না? তোদের মধ্যে কি কোন রাগারাগি হয়েছে? যদি হয়েও থাকে, তাই নিয়ে গিট ধরে থাকতে হয়? তুই যা বৌ-ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আয়।'

অভীক কোন রকমে 'হ্যাঁ হুঁ করে কথাটা এড়িয়ে যায়। কিন্তু বুঝতে পারছে, বেশি দিন হয়তো সত্যটা গোপন রাখা যাবে না। তবু, যে কটা দিন বৃদ্ধার মনে আঘাতটা না দিয়ে পারা যায়।

সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে বেশ কেটে যায়। রাতে এই বাড়ি ফেরার সময় হাঁটতে হাঁটতে চিন্তাগুলো অভীকের মাথায় এসে জড় হয়। তখন শারীরিক আর মানসিক ক্লান্তিতে পা যেন চলতে চায় না। তবু ধীরে ধীরে এসে পৌঁছায় বাড়িতে।

* * * * *

তিন কাঠা জমির উপর চারটে ঘর নিয়ে বাড়িটা। একটা বসার ঘর। একটা মায়ের জন্যে। একটা নিজেদের। আর একটা বাড়তি। বছর দশেক আগে যখন বাড়িটা তৈরী হয়, তখনই অভীক 'প্ল্যানার' কে বলেছিল এমনভাবে 'প্লানটা করে দিন যেন একটা ঘর একটু আলাদা থাকে অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। বাড়তি ঘরটা তৈরী করেছিল বাড়তি লোকজন এলে যাতে কোন অসুবিধে না হয় সেই ভেবে। কলকাতার কাছেই বাড়ি করছে, তাই অভীক ধরেই নিয়েছিল ঠেকায় বেঠাকায় আত্মীয়স্বজন তো বটেই, গ্রামের লোকজনও আসবে অভীকদের বাড়িতে। কেউ হয়তো ছেলের হাত দিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে বলবে, অভীক ছেলেটা কলকাতায় একটা চাকরীর 'ইন্টারভিউ' পেয়েছে। তোর ওখানে গিয়েই উঠছে, আপত্তি করিস না। আবার হয়তো কেউ বলে পাঠালো, চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় দেখাতে যাচ্ছে মেয়েটা। প্রথমদিকে তোর ওখানে রেখে বন্দোবস্ত করে দিস।

এখনকার দিনে এত ভেবে কেউ বাড়ি করে না। কিন্তু অভীক গ্রামের ছেলে আর গাঁয়ের সবার সাথে ওর যে রকম সম্পর্ক তাতে ও ধরেই নিয়েছিল এরকম অনুরোধ

ওর কাছে না এসে যাবে না। তাই প্রথম থেকেই এই বিষয়টা মাথায় রেখেছিল। আসলে অভীক যে কোনদিন বিয়ে করবে। সংসারী হবে, এটা সে চিন্তাতেও আনেনি। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিয়েটা যখন করতে হোল, তখন ভেবেছিল সংসারটা সুষ্ঠভাবেই করবে।

দশ বছর আগে পার্টির সদর দপ্তরে একটা গ্রুপ মিটিং সেরে সবাই বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ পার্টির সেক্রেটারী মিহিরবাবু অভীক আর মল্লিকাকে ডেকে বলল, 'তোমরা একটু পরে যেও, তোমাদের সাথে কথা আছে।' কোনরকম ভূমিকা না করেই মিহিরবাবু বলেছিলেন, 'অভীক, পার্টির নির্দেশ, মল্লিকাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। তোমরা দুজনে পরস্পর কথা বলে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে নাও। কিছুদিনের মধ্যেই আমি রেজেস্ট্রির ব্যবস্থা করে দেব।'

আচমকা কথাটা শুনেই অভীক কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'মল্লিকাদিকে?'

মিহিরবাবু বললেন, 'এখন আর মল্লিকাদি নয়। মল্লিকা তোমার সমবয়সী বা এক-দুবছরের বড়ও হতে পারে। তাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা দুজনেই খুব ভাল কর্মী। এ যাবৎ দুজনেই খুব সুনামের সাথে কাজ করে এসেছো। তাই পার্টি চায় না তোমরা অন্যত্র বিয়ে করে আর পাঁচজন সংসারী মানুষের মত সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাও। তাই তোমরা পরস্পর একই মানসিকতার দুটি মানুষ জুটি বাঁধলে সে আশঙ্কা হয়তো থাকবে না।'

অভীক উত্তর দিয়েছিল, 'কিন্তু, বিয়ে করার কথা আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি?'

"না, তুমি কেন, মল্লিকাও বলে নি। কিন্তু মল্লিকার বাড়ি থেকে খুব চাপ আসছে। ওর বাবা মা ওকে চাপ দিয়ে রাজি করাতে না পেরে আমাদের কাছে এসেও দরবার করেছে। যাতে আমরা ওকে রাজি করাই। ও বড়বোন। ওর বিয়ে না হলে অন্য ভাই-বোনদের বিয়ে দিতে তিনি অসুবিধে বোধ করছেন। জানি আজকালকার দিনে এটা কোন যুক্তি নয়। কিন্তু মল্লিকাদের বাড়িটা খুব কনজারভেটিভ। ওর বাবা-মা বিশেষ করে ঠাকুমা বড় নাতনির বিয়ে না দিয়ে অন্যদের বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না। তুমি তো জান মল্লিকা কত বড় ধনী বনেদি বংশের মেয়ে। ঐ পরিবার থেকে ছিটকে এসে মল্লিকা যে সমাজতন্ত্রের রাজনীতিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছে এটা ভাবা যায় না। আমরা ওকে হারাতে চাই না। তাই ভেবে দেখলাম তোমার সাথে মল্লিকার ম্যাচিং-টা ভাল হতে পারে। শিক্ষাগত ও পেশাগত দিক থেকে দুজনেই ডক্টরেট এবং অধ্যাপনা কর। সক্রিয় কর্মী হিসাবে তোমাদের দুজনেরই সুনাম আছে। তাই পার্টি মনে করে তোমাদের মধ্যে বিয়েটা হলে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

পার্টির সিদ্ধান্ত সব সময়ই মাথা পেতে নিয়েছে অভীক। শুধু মাথা পেতে নেওয়া নয়, চেষ্টা করেছে প্রত্যেকটা কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার। কিন্তু অচমকা পার্টির এরকম

একটা সিদ্ধান্তে অভীক সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই সময় বার বার মার কথাটা মনে পড়তে লাগল। কতবার তার বিয়ের জন্যে মা বলেছে, 'অভি, তুই বিয়ে করতে রাজি-হ। আমি দেখেশুনে তোর বিয়েটা দিয়ে যাই। মরার আগে তোর যদি একটা স্থিতি দেখে যেতাম তবে শান্তিতে মরতে পারতাম।' মা যতবার বিয়ের কথা বলেছে, অভীক ততবারই নাকচ করে দিয়েছে। বলেছে 'মা আমার জীবনটা তো আর পাঁচজন লোকের মত গতানুগতিক নয়। কেন শুধু শুধু একটা মেয়েকে আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে বিব্রত করে তুলবে?'

অভীক অবাক হলেও মল্লিকা কিন্তু অবাক হয় নি। ক্রমাগত তার বিয়ের ব্যাপারে বাড়িতে যে রকম চাপ আসছিল;তাতে বুঝেছিল দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রাখা কষ্টকর। তাছাড়া ওর বিয়েটা না দিয়ে ভাই বা বোনের বিয়েটা দিতে বাড়ি থেকে রাজি নয়। সেক্ষেত্রে ওর জন্যে অন্যেরা বিব্রত বোধ করুক তা ও চাইছিল না। কিন্তু তাই বলে যার তার সঙ্গে বাবা-মা পছন্দ করে দিলেই তাকে স্বামী হিসাবে মাথায় করে নেওয়ার মেয়ে সে নয়। ছোটবেলা থেকেই এক রোখা, জেদী আর প্রচণ্ড আত্মঅভিমানী। তার মন এবং মতের সাথে স্বামীর মিল না হলে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কষ্টকর। মিহির বাবু প্রস্তাব দেওয়ার পরে মল্লিকা ভেবে দেখেছিল। যদিও অভীকের পরিবারের সাথে মল্লিকাদের পরিবারের মিল নেই; তবু অভীক একজন উচ্চশিক্ষিত। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। সর্বোপরি সাম্যবাদের নীতিতে বিশ্বাসী একজন সহ কর্মী কমরেড। তাই রাজি হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন বাদে মিহির বাবু তাদের দুজনকে ডেকে আবার বললেন, ' তোমাদের মধ্যে কথাবর্ত্তা সেরে নিয়েছো তো? আমি আর দেরী করতে চাই না। ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রি অফিসে নোটিশটা দিয়ে দিচ্ছি।'

দুজনেই তখন নীরব থেকে সম্মতি দিয়েছিল। বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন অভীক ভেবেছিল বাসা বাড়িতে বেশিদিন আর থাকবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের তৈরী বাড়িতেই উঠে যাবে। সেই সঙ্গে বাইরের কাজের সাথে সংসারটাও করবে ভাল ভাবে। তাই একদিন মল্লিকাকে সাথে নিয়ে অভীক কলকাতার কাছেই তিন কাঠার প্লটের এই জমিটা কিনেছিল। বাড়িও বানিয়েছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ছোটর মধ্যে বেশ সাজানো গোছানো। চারপাশে কিছু ফুলের গাছও লাগিয়েছিল মল্লিকা। নানা রকম গাছের মধ্যে রজনীগন্ধার উপরেই ছিল মল্লিকার ঝোঁকটা বেশি। জ্যোৎস্না রাতে সাদা সাদা ফুলগুলো যখন লাইন দিয়ে গাছে ফুটে থাকত তখন বেশ ভালই লাগত অভীকের। যেদিন একটু বাতাস বইত রজনীগন্ধার সুমিষ্ট গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ত সারা ঘরে। বিয়ের দুবছরের মাথায়ই এসেছিল সুমন। বলতে গেলে এই দু-বছরই ছিল মল্লিকা আর অভীকের মধ্যে এড্‌যাস্টমেন্ট। তারপর শুরু হয়েছিল ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে 'পার্সোন্যালিটির ক্লাস'; নীতির প্রশ্নে

আপোষহীন দ্বন্দ্ব। তারই পরিণতিতে একদিন সুমনকে নিয়ে মল্লিকা চলে গেল একটা রেন্টেড্ ফ্ল্যাটে। সে প্রায় দু-তিন মাস আগের কথা।

* * * * *

অভীকের সাথে বৌমার মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়, তা বিনোদাদেবী শুনতে পেতেন। সে তো সব স্বামী-স্ত্রীতেই হয়। তার জন্যে বৌমা যে নাতিকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যাবে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। তাই এতদিনেও বৌমা না ফেরায়, আবার একদিন বিনোদাদেবী অভীককে বললেন, "অভী বৌমা বোধহয় তোর উপরে খুব দুঃখ পেয়ে বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। এরকম হয়েই থাকে। তুই একদিন যা, গিয়ে ওদের নিয়ে আয়।' আজও সকালে অভীক বেরুনোর সময় বিনোদাদেবী বলেছিলেন, 'ক দিন ধরেই তো কথাটা বলছি। উত্তর দিচ্ছিস না। আজ তুই যা বৌমার বাপের বাড়িতে।'

অভীক চুপ করে থাকায় বিনোদাদেবী ভেবেছিলেন অভীক যাবে। কিন্তু অভীককে একলা বাড়ি ফিরতে দেখেই বিনোদাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'বৌমা আজও এলো না?'

অভীক সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। ভাবল কত দিন আর কথাটা চেপে রাখা যাবে। একদিন তো বলতেই হবে। তাই একটু দম নিয়ে বলল, ' বৌমা আর আসবে না। কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো আমার বিরুদ্ধে ডাইভোর্সের মামলা শুরু করবে। তুমি মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা কর। আমরা তো আগে এই রকমই ছিলাম।'

বিনোদাদেবী অভীকের কথাটা চট্ করে ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তাই বললেন, 'তুই বলছিস কি?'

অভীক বলল, 'কি আর বলব?'

—'তাহলে আমার খোকা?—তার কি হবে?'

—'ওর তো এখন বয়স অল্প, কোর্ট হয়তো ওকে মার কাছে রাখারই রায় দেবে। পরে যদি বড় হয়ে কখনো আসতে চায় তো আসবে।'

কথাগুলো অভীক সহজে বলে গেলেও, বিনোদাদেবীর মগজে সহজে প্রবেশ করল না। বিস্ময়ে হতবাক তিনি, অভীকের দিকে চেয়ে রইলেন।

* * * * *

সে রাতে, আর কোন কথা হোলনা। অভীক ঘুমাতে গেলেও বিনোদাদেবী নিজের ঘরে খাটের উপর বসে রইলেন অনেকক্ষণ। দীর্ঘদিনের পুরোনো কথাগুলো তার মনে পড়তে লাগল। বর্দ্ধমানে বাপেরবাড়ি থেকে মেদিনীপুরে কাঁথির কাছে এক গ্রামে শ্বশুর

বাড়িতে যখন এলেন তখন বয়স এগারো। ভরা সংসার। শ্বশুর, শাশুড়ী, দুই ভাসুর, ননদ, জা আরও পাশাপাশি জ্ঞাতিগুষ্টি। তার কর্ত্তাই ছিল সবার ছোট। বাড়ির ছোটো বৌ হয়ে সবাইকেই তাকে মান্য করে চলতে হোত। শাশুড়ী আদরও যেমন করত; সে রকম বাকাবকিও করেছে কম না। পরবর্ত্তীকালে সংসার করতে গিয়ে পরিবারের লোকজনের সাথে ভাব-ভালবাসাও যেমন হয়েছে আবার কখনো সখনো মনোমালিন্যও হয়েছে। কিন্তু কোন সময়ের জন্যে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন নি। অভী তার একমাত্র সন্তান। পরপর পাঁচটা সন্তান মারা যাওয়ার পর অভীর জন্ম। জন্মের পরই পাড়ার একটা বুড়ি ওর কান বিঁধিয়ে দিয়ে বিলেছিল, 'বৌমা তোমার ছেলেকে দিলাম খুঁত করে। এই খুঁত জিনিস ভগবান অত শিগ্রী নেবে না দেখো।'

সত্যিই, যার জন্যেই হোক অভী বেঁচে গিয়েছিল। পাঁচটা সন্তান মারা যাবার পর এই সন্তান। স্বভাবতঃই মানুষ হয়েছিল একটু বেশি আদরে। এই আদরই তাকে করে তুলেছিল জেদী একরোখা। যেটাকে সে ভাল বুঝবে সেটাকেই সে আঁকড়ে থাকবে। শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। ছোটবেলা থেকেই তার ভাব গ্রামের যত ক্ষেত মজুর, বর্গাদার, গরীব চাষীর ছেলেমেয়েদের সাথে। তাদের নিয়ে সে তৈরী করেছিল একটা দল। গ্রামে যেখানে যখন কোন অন্যায় অবিচার বা বিপদ-আপদ দেখা দিত তখনই সবাই মিলে সেখানে গিয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করত। 'ঘরের খেয়ে এই বনের মোষ তাড়ানো' স্বভাবের জন্যে বাড়িতে কম বকাবকি শুনতে হয় নি। কিন্তু বক্‌লে উলটো ফল হতো। আরও বেশি করত। যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করত। সবাই যদি পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যায় তবে অন্যায় অবিচার তো চলতেই থাকবে। ধীরে ধীরে তার কর্ম পরিধি গ্রাম ছেড়ে প্রসারিত হয়েছিল সমগ্র জেলায়। একবার তো জেলা সদরে একটা মিছিলের পুরোভাগে থেকে পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিশের লাঠি পড়েছিল মাথায়। মাথা ফেটে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল রাস্তায়। কে একজন সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করে খবর দিয়েছিল বাড়িতে। তখন বাড়িতে সে কি কান্নাকাটি। সুস্থ হয়ে উঠে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করে দিল পার্টি। পার্টির কাজকর্ম করলেও পড়াশোনাকে কখনও অবহেলা করে নি অভীক। আসলে মাথাটা ছিল খুব ভাল। তাই পড়াশোনা যেটুকু সময় করত মন দিয়েই করত। স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল ডিস্ট্রিক স্কলারশিপ নিয়ে। বারো ক্লাশও পাশ করেছিল প্রথম বিভাগে ভাল নম্বর নিয়ে।

বারো ক্লাশ পাশ করার পর স্কুলের শিক্ষকেরা বাড়ির অভিভাবককে বলেছিল, ' অভীককে এবার কলকাতার কলেজে পড়াশোনার জন্যে পাঠান। গ্রামের কলেজে হয়তো ততটা ভাল 'গাইডেন্স' পাবে না। ওর পড়াশোনায় এত আগ্রহ, মাথাটাও এত ভাল আমাদের মনে হয় কলকাতায় ভাল গাইডেন্স পেলে ও খুব বড় হতে পারবে।'

* * * * *

একে ডান পিঠে ছেলে তারপর কিছুদিন আগে বাবা মারা গেছে। বিনোদাদেবীর ছেলেকে কলকাতায় পাঠানোর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন ছেলেকে তো চিরকাল কোলের কাছে রেখে দেওয়া যাবে না। এখন নিজের ফাঁকা লাগবে বলে ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবেন? তাই রাজি হয়ে ছিলেন; অভীককে কলকাতায় কলেজে পড়াতে।

কলকাতার একটা নামী কলেজেই ভর্ত্তি হয়েছিল অভীক। থাকার জায়গা হয়েছিল কলেজ হোষ্টেলে। হায়ার সেকেন্ডারীতে ইংরেজী ও ইতিহাসে ভাল নম্বর পেয়েছিল। কিন্তু অভীক ঠিক করল ফিলসফি নিয়ে পড়বে। ভারতীয় দর্শনকে জানা তার খুব আগ্রহ। তাই ফিলসফি অনার্স নিয়ে ভর্ত্তি হলো কলেজে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে সে খুঁজে পেতে চায় সাম্যবাদের কথা। শ্রীচৈতন্যের প্রতি ছোটবেলা থেকেই তার খুব আগ্রহ। জাতিভেদহীন সর্বজীবে সম আচরণকারী এমন ব্যক্তিত্ব তাকে মোহিত করে। আর মোহিত করে স্বামী বিবেকানন্দ। ইতিমধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী প্রায় সবটাই সে পড়ে ফেলেছে। কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যেই সে বিভিন্ন লাইব্রেরীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। নিজের ক্লাশের পড়াশোনার সাথে সাথে নানা রকম বই সে পড়া শুরু করেছিল। তবে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল সাম্যবাদের উপর লেখা বইগুলির প্রতি। তার খুব আগ্রহ ছিল মার্কসীয় সাম্যবাদের সাথে শ্রীচৈতন্য ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ভিত্তিক সাম্যবাদের তুলনা করে দেখা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ লোকের সাথেও তার পরিচয় গড়ে উঠেছে। তাদের সংস্পর্শে নিজের প্রতিভার স্ফুরণও হতে শুরু করল। সাম্যবাদের উপর কিছু কিছু লেখা দু একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এমনই একটা লেখা পড়ে পার্টি সম্পাদক মিহির দত্তের আগ্রহ হল অভীকের সাথে পরিচিত হতে। ঐ কলেজেই এক সহপাঠীর মাধ্যমে সম্পাদক মিহিরদার সাথে অভীকের পরিচয় হয়। পরে পার্টির প্রতি মিহিরদার একনিষ্ঠতা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন দেখে অভীক তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সেই থেকে অভীকও হয়ে যায় পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। প্রথমে ছাত্র আন্দোলন, পরে যুব আন্দোলন, ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে অভীকের ভূমিকা হয়ে ওঠে অপরিহার্য্য।

এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচয় ঘটে বহুজনের সাথে। এইভাবে অনেকের সাথে পরিচয়ের সূত্রে এক সময় অভীকের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল মল্লিকা রায়ের।

* * * * *

অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে মল্লিকা। সাম্যবাদের রাজনীতিতে আসার কথা নয়। তবু

এসে পড়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে অভীকদের থেকে এক ক্লাস উপরে পড়ত। পড়াশোনাতে মল্লিকা ছিল খুবই ভাল। দেখতেও বেশ সুন্দরী। সব মিলিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার বোধ ছিল মনের ভিতর। বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। যেটা প্রকাশ ছিল, সেটা হচ্ছে সব কিছুতেই কর্ত্তৃত্ব করার একটা মনোভাব। এরই জন্যে কলেজে পড়ার সময় ছাত্রী সংসদে হয়েছিল জেনারেল সেক্রেটারী। ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদে স্থান পেয়েছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখায়। মল্লিকার এই অরগানাইজিং ক্যাপাসিটিটা মিহিরবাবুর নজর কেড়েছিল। তাই পরবর্ত্তীকালে মল্লিকা প্রফেসারীতে যোগ দিলে তাকে ভার দিয়েছিলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আন্দোলনে এক অগ্রণী ভূমিকা পালনে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর কর্ত্তত্বের এই লোভ মল্লিকাকে করে রেখেছিল মোহাচ্ছন্ন। তাই বাড়িতে তার বিয়ের কথা উঠলেই মল্লিকা একটা না একটা অসুবিধের কথা বলে এড়িয়ে যেত। মল্লিকার আরও এক ভাই ও বোন আছে। তারাও বেশ প্রতিষ্ঠিত ও বিবাহযোগ্য। কিন্তু মল্লিকার মা এবং ঠাকুমা মল্লিকার বিয়ে না দিয়ে অন্যের বিয়ে আগে দিতে রাজি নয়। বিশেষ করে ঠাকুমা, তার আদরের নাতনি চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে পার্টি পার্টি করে সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই নিজেরা চেষ্টা করেও যখন মল্লিকাকে রাজি করাতে পারলেন না, তখন মল্লিকার বাবা প্রায়ই এসে ধরতেন মিহিরবাবুকে, তিনি যদি মল্লিকাকে আজ্ঞা করেন তবে সে কখনো ফেলতে পারবে না।

মিহিরবাবু মল্লিকার বাবা-মায়ের বক্তব্য শুনে বলেছিলেন, 'দেখি কি করা যায়।'

পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে অভীক ও মল্লিকা দু'জনই ছিল মিহিরবাবুর স্নেহের পাত্র। দুজনেরই 'একাডেমিক ক্যারিয়ার' ভাল। ডক্টরেট, প্রফেসারী করে। মিহিরবাবু তাই ভেবে ঠিক করলেন এদের দুজনের যদি বিয়েটা হয় তবে সব দিকটাই রক্ষে পায়। তাই একদিন গ্রূপ মিটিং-এর পর ওদের দুজনকে থাকতে বলে সোজাসুজি প্রস্তাব রাখলেন—পার্টির নির্দ্দেশ বলে।

* * * * *

অভীকের বাবা যখন মারা যান তখন তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বেঁচে। যৌথ সংসারের হাল তখনও ঠাকুদার হাতে। তাই অভীকের পড়াশোনার খরচ জোগাতে কোন অসুবিধে হয় নি। শহরে থেকে পড়াশোনা করলেও গ্রামের সাথে অভীকের ছিল নিবীড় সম্পর্ক। মাঝে মাঝে চলে আসত দেশের বাড়িতে। পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজখবর নিত। গ্রাম-উন্নয়নের জন্যে যে দল গড়েছিল, উৎসাহ দিয়ে তাকেও চালু করে যেত। কিন্তু ছোট ছেলের মৃত্যুতে ঠাকুর্দা যে আঘাত পেয়েছিল তাতে দিনকে দিন তার শরীরটা ভেঙে

পড়েছিল। শেষে তিনি নিজেই একদিন ছেলে-মেয়েদের ডেকে বল্লেন, আমার স্বাস্থ্য আর ভাল যাচ্ছে না। এবার হয়তো যাওয়ার সময় হয়েছে। আমি থাকতে থাকতে তোমাদের মধ্যে জমি জমা, টাকা-পয়সা সব বিলি-বন্দোবস্ত করে দিয়ে যেতে চাই। যাতে এখন তোমাদের মধ্যে যে রকম সদ্ভাব আছে; আমার মৃত্যুর পরও তোমাদের মধ্যে তেমন সদ্ভাব থাকে। পারিবারিক মনোমালিন্যের উৎস বেশির ভাগই তো বিষয়।'

ভাগ-বাঁটায়োরা হয়ে যাওয়ার পর অভীকদের ভাগে যা পড়েছিল তা দেখাশুনো করার ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজেই। ছেলে বেঁচে নেই। নাতি-ছেলে কলকাতায় থাকে। বৌমা একা মানুষ। সহজ সরল প্রকৃতির। জমি জমার চাষ আবাদ দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি নিয়েছিলেন সেই ভার। কিন্তু বেশিদিন তার শরীর টিকল না। বছর কয়েকবাদেই একদিন মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাকে'। অভীক অবশ্য সে কয় বছরে এম. এ পাশ করে 'স্লেট' পরীক্ষা দিয়ে চাকরী পেয়েছে একটা কলেজে। সাথে পি. এইচ. ডি. পাওয়ার জন্যে গবেষণা বিষয়ক কাগজপত্র জমা দিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। যেদিন পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়ে অভীক মাকে প্রণাম করতে এলো সেদিন পরিবারের সবারই কি আনন্দ।

* * * * *

অভীক চাকরী পাওয়ার পরে ছেলের বিয়ের জন্যে বিনোদাদেবী অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অভীক কিছুতেই এতদিন রাজি হচ্ছিল না। বারবারই সে মাকে বোঝাতো, মা, নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট জীবন আমার নয়। কি হবে একটা মেয়েকে আমার জীবনের সাথে জুড়িয়ে দিয়ে তাকে অনিশ্চিয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে।

বিনোদাদেবী বলতেন, কেন? রাজনৈতিক নেতারা কি তাহলে সংসারী হয় না?"

অভীব বলত, 'হবে না কেন? সে সময় এখনও আমার আসে নি।'

মায়ের কথা এভাবে ঠেকিয়ে রাখলেও মিহিরদা যখন আজ্ঞার সুরেই বললেন, 'মল্লিকাকে তোমার বিয়ে করতে হবে এটা পার্টির নির্দ্দেশ। মানসিক দিক থেকে তুমি প্রস্তুত হয়ে নেও।' তখন সে আদেশ ফেরানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল।

কিছুদিন বাদে মিহিরদাই ওদের দুজনকে ডেকে রেজিষ্টির দিন বলে দিলেন। অভীক সেদিন বাড়িতে গিয়ে হঠাৎই মাকে বলল, 'মা তুমি আমার বিয়ের কথা প্রায়ই বল, একটা মেয়ে ঠিক হয়েছে। যদিও আমাদের পালটি ঘর নয় তবু বনেদি পরিবারের মেয়ে। অবস্থাপন্ন ঘর।'

ছেলের এই বিয়েতে বিনোদাদেবী আশাহত হলেও মেনে নিয়েছিলেন। কত আশা ছিল একমাত্র ছেলের বিয়ে দেবেন নিজে দেখে শুনে; গ্রাম শুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করে।

কিন্তু এ বিয়ে হয়ে গেল কলমের খোঁচায় রেজিস্ট্রি করে। গ্রাম শুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর পরিবর্তে অভীক গোঁ ধরে বলেছিল, মা গ্রামের লোককে একদিন খাওয়ানোর পরিবর্তে, তুমি অনুমতি দাও এই বিয়ে উপলক্ষ্যে আমি কিছু লোককে সারা বছর খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করে দিই।' মাকে বুঝিয়েছিল, 'মা এখন তো আমি চাকরী পেয়েছি। খাওয়া পরার এখন আর আমাদের অসুবিধে হবে না। গ্রামের গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরেরা পেট পুরে খেতেও পায় না। আমাদের ভাগে যে জায়গা জমি আছে, তুমি অনুমতি দাও। আমি ওদের মধ্যে বিলি করে দিই ভাগচাষী বা বর্গাদার হিসাবে। ওরা জমিটা নিজের করে পেলে আরও বেশি মন দিয়ে ফসল ফলানোর চেষ্টা করবে। তাতে ওদের দুবেলা দুটো খাওয়ার সংস্থান হবে। আর কিছু পরিমাণ ফসল যা আমাদের দেবে আমাদের তো তাতেই অনেক হয়ে যাবে।'

বিনোদাদেবী বুঝেছিলেন ছেলের মাথায় যখন এই চিন্তাটা ঢুকেছে তখন আজ হোক কাল হোক করেই ছাড়বে। তাই প্রথম দিকে একটু আপত্তি থাকলেও পরে ছেলের মতেই মত দিয়েছিলেন।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার কাছে বাড়িটা করে মাকে নিয়ে এসেছিল অভীক। ভালই চলছিল অভীক-মল্লিকা আর বিনোদাদেবীর সংসার। শাশুড়ী হিসাবে একটু আধটু অভিযোগ বিনোদাদেবীর যে ছিল না তা নয়। বিনোদাদেবী গৃহস্থ ঘরের গ্রামের বৌ। জ্ঞানত জানেন ঘরের বৌ চওড়া করে সিঁথিতে সিন্দুর পরবে, কপালে টিপ দেব, হাতে শাঁখা-পলা-নোয়া পরবে। কিন্তু মল্লিকা শাঁখা পলা পরত না। হালকা করে শুধু সিঁথিতে একটু সিঁন্দুর পরত। এসব নিয়ে বিনোদেবী কয়েকটা দিন মল্লিকাকে বলেছিল, বৌমা, শাঁখা-সিন্দুর ঠিক মত না পরলে স্বামীর অকল্যাণ হয়। একটু পরলেই পার।'

মল্লিকা কোন উত্তর দেয়নি। কিন্তু কথাটা শোনেও নি। বিনোদাদেবী মনে মনে আশা করতেন বৌমা যদি ঘরের সন্ধ্যেটা দেয় তবে ভাল হয়। লক্ষ্মীর পাঁচালিটা পড়ার কথাও একদিন বলবেন ভেবেছিলেন। তা বৌমা কলেজে ক্লাশ না থাকলেও সমিতির কাজ সেরে বাড়ি ফেরে সেই রাতে। কোনদিন বা অভীকেব কিছু আগে। কোনদিন বা তারপরে। মল্লিকা শাশুড়ীর মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরে একদিন অভীককে বলেছিল, 'তুমি নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না। অথচ বাড়িতে ঠাকুর দেবতার আসন পেতছ। নিত্য পুজো হচ্ছে এতে তোমার বাধে না?'

অভীক বলেছিল, 'ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই সেটা আমার নিজের ব্যাপার। তাই বলে অন্যের বিশ্বাসে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তাছাড়া ঈশ্বর আছে এটা প্রমাণ করা যত কঠিন, ঈশ্বর নেই একথা প্রমাণ করাও কিন্তু তার চেয়ে কম কঠিন নয়। যাকে আমরা দেখতে পাই না, সে যে নেই এ কথা বলি কি করে?'

—'তার মানে? তুমি কি এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শুরু করেছ নাকি?'

—'আমার কথার অর্থ কি তাই দাঁড়াল, যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শুরু করেছি।' ঈশ্বর আছে কি নেই এই সমস্যার সমাধান করতে আমি একটুও আগ্রহী নয়। সমাজে কত সমস্যা আছে, তার সামান্যতমও যদি আমি সমাধান করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

ছোটো খাটো এরকম বিষয় নিয়ে মল্লিকা ও বিনেদাদেবীর মন কষাকষি চললেও সুমনের জন্মের পর বিনোদাদেবী সুমনকে ঘিরেই তার জগৎ করে নিয়েছিলেন। একমাত্র ছেলের ঘরের সন্তান, তাকে তো প্রাণ দিয়ে ভালবাসবেনই। কিন্তু মল্লিকা আর অভীকের মধ্যে দেখা দিল ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। যা প্রথম দু-এক বছর ছিল সুপ্ত। পরবর্ত্তীকলে প্রকাশ পেল তীব্র আকারে। আসলে মল্লিকা ছিল স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা, শহরে অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। আর অভীক মূলত সুদূর গ্রামের কৃষি ভিত্তিক পরিবারের ছেলে। পার্টির নির্দ্দেশে মল্লিকা অভীককে বিয়ে করলেও মনের দিক থেকে মেনে নিতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। তাই বিয়ের কয়েক বছর বাদেই মল্লিকার কথা-বার্ত্তায়, আচার-আচরণে প্রকাশ পেতে থাকল অসন্তোষ । অভীক মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু যখন দেখল মল্লিকা তাকে দাবিয়ে রেখে তার উপর প্রভাব ঘাটানোর চেষ্টা করছে, তখনই শুরু হলো ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। অভীকের বিরুদ্ধে মল্লিকার প্রধান অভিযোগ অভীক লোকের কাছে সাম্যবাদী, প্রগতিশীল, নারীমুক্তির প্রবক্তা বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে সে একজন রক্ষণশীল কুপমণ্ডুক। রক্ষণশীল ধ্যান ধারনা থেকে সে এখনও বেরিয়ে আসতে পারে নি। মুখে নারী স্বাধীনতার কথা বললেও মনে মনে সে চায় নিজের বৌটিকে ঘরের মধ্যে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে। যা তাকে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

অভীক কিন্তু মল্লিকার এই অভিযোগ মেনে নিতে পারেনি। তার মতে পরিবারে বা সমাজে পরিবর্ত্তন আনতে হবে মানে পুরানো সব রীতি নীতি নস্যাৎ করে নেয়। পুরোনো মানেই খারাপ, এটা সে মেনে নিতে পারে না। পুরানোর মধ্যে খারাপ যেমন আছে ভালও তেমন আছে। খারাপকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে সে নির্দয় হতে প্রস্তুত। কিন্তু যেগুলো ভাল সে গুলোকে সে লালন করে আরও ভাল কি করে করা যায় তার চেষ্টাই করতে চায়।

কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়েও মল্লিকার সাথে অভীকের মত বিরোধ শুরু হয়। মল্লিকার মতে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যেটা ঠিক, সেটা বিশ্ব জুড়েই ঠিক। কিন্তু অভীকের বিশ্বাস, বিশ্বজুড়ে তা নীতিগত ভাবে ঠিক হতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োগ পদ্ধতি দেশে দেশে হওয়া উচিত আলাদা, যা সেই দেশের ভৌগোলিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত।

জ্ঞানে, বিচার-বুদ্ধি তে মল্লিকা বা অভীক কেউ-ই কারও থেকে ছোট নয়। তাই নিজ নিজ চিন্তা ধারা থেকে কেউ-ই সরে আসতে বাজি নয়। এই বিরোধ ধীরে ধীরে এমন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছালো যে মল্লিকা মনে করতে লাগল অভীক ক্রমশঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুযোগ নিয়ে তার নারী অধিকারকে অস্বীকার করতে চাইছে। সে তাই এই বন্ধন থেকে মুক্তি চায়।

অভীক এবং মল্লিকার এই দ্বন্দ্বের কথা এক সময় পার্টির সম্পাদক মিহির দত্তর কানেও পৌছালো। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনিও চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা আনতে। তার চেষ্টায় কিছু দিনের জন্যে স্তিমিত হলেও তা আবার প্রকট হয়ে উঠল।

তাই একদিন মল্লিকা সোজাসুজি অভীককে বলে ফেলল, 'দেখ, এভাবে তিলে তিলে নিজেকে আর ক্ষয় করে দিতে আমি রাজি নই, আমি 'সেপারেশন' চাই'।

অভীক কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে বলল, 'সেপারেশন' বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? এখন আমরা দুজনে যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছি তাতে বলা যায় একই ছাদের তলায় থেকে দুজনে দুজন থেকে বহুদূরে। এ'টা তো এক রকম সেপারেশনই। লোক সমাজে তবু এতে একটা স্থিতাবস্থা বজায় আছে।'

মল্লিকা বলল, 'ঠিকই। আমি এই অবস্থার মধ্যে দিয়েও চলতে চাই না আমি সুমনকে নিয়ে কালই চলে যেতে চাই।'

—'কালই'?

—'হ্যাঁ'

অভীক একবার ইতঃস্তত করল; 'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে কিনা। তবু ছেলের কথা ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়? বাপের বাড়িতে?'

—'না। তাদেরও আমি বিব্রত করতে চাই না। গড়িয়ার হাউজিং কমপ্লেক্সে' আমি একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়েছি। সেখানে একলাই থাকতে চাই।

—'তা থাকতে পার। তবে লোকচক্ষে সেটা ভাল দেখাবে না।'

মল্লিকা সংযম হারিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ এক কথা ভাল দেখাবে না, ভাল দেখাবে না। তাই বলে, এই উপরে প্রলেপ দিয়ে আর নিচে ক্ষত; এ জিনিস আমি সহ্য করতে পারছি না।'

—'ঠিকই। সবাই সব কিছু সহ্য করতে পারে না। তোমাব সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তুমি এইভাবে আলাদা না থেকে আমার বিরুদ্ধে 'ডাইভোর্স' চেয়ে মামলা স্যুট' করতে পার আমি 'অপোজ' করবো না।'

—'দরকার হলে তা-ই-করবো সেটা আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছি। তবে ডাইভোর্স মামলা 'স্যুট' করলেও সেটা দ্রুত নিষ্পত্তি করে তোমাকে তাড়াতাড়ি আর

একটা বিয়ের সুযোগ করে দেব না। আর একটা বিয়ে মানেই আর একটা মহিলাকে তোমার অন্তঃসারশূন্য পৌরুষত্বের নিষ্পেষনে ঠেলে দেওয়া। সেটা আমি হতে দেব না।'

—' তোমার ধারনাটাই ভুল।' পুরুষের পৌরুষত্ব যেমন গৌরবের, স্বভূমিকায় নারীর নমনীয়তাও কিন্তু কম গৌরবের নয়, কেউ-উ তাকে ছোট করে দেখে না।'

—' সেটা গাল ভরা কথায়। কার্যত নয়। কার্যত যুগ যুগ ধরে পুরুষের কাছে নারীকে করে রেখেছ পদানত। তার নিজস্ব স্বত্বাকে দিয়েছ হারিয়ে।'

—'আবারও বলছি, তোমার ধারণা ভুল। যে শিক্ষার গরবে তুমি এটাকে নারীর পরাজয় বলে মনে করছ। আমার ধারণায় নারীর জয়টা পুরুষের থেকে সেখানেই। সব পরাজয়ই কিন্তু অগৌরবের নয়। গুরুর গৌরব বা জয় কিন্তু শিষ্য বা পুত্রের কাছে পরাজয়েই।'

মল্লিকা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। রেগে বলে উঠল, আমি তোমার কাছে আর জ্ঞানের বাণী শুনতে চাই না। আমি যা ঠিক করেছি—আমার পথেই চলতে চাই।'

অভীক আর কথা বাড়াল না।

* * * * *

পরদিন অভীক বাড়ি ফিরল অনেক রাতে। আসলে ও চায়নি ওর সামনে দিয়ে মল্লিকা আর সুমন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাবে আর সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। একবার ভেবেছিল ছেলের দাবী তুলে সুমনকে আটকাবার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে মার কথা ভেবে। এ কয়টা বছর মা যে ভাবে সুমনকে কোলে পিঠে করে আগলে রেখেছে, তা ভাবা যায় না। হঠাৎ এভাবে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে, আঘাতটা সহ্য করা কষ্টকর হবে। কিন্তু অভীক চিন্তা করে দেখেছে। ঠাকুমার কাছে নাতি যত আপনই হোক, সন্তানের কাছে মায়ের থেকে বেশি কেউ আপন হতে পারে না। তা সে বাবাও নয়। তাই বাধা দেয় নি।

সে দিনের কথাটা আজও মনে আছে অভীকের। ট্রেন থেকে নেমে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অভীক বাড়ির দরজার গোড়ায় এসে বেল টিপল। দরজা খুলে দিয়ে বিনোদাদেবী বললেন, 'অভী, তুই আজকে আসতেও এত রাত করলি? জানতিস তো আজ বৌমা খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাবে। আজ যাওয়ার সময় দেখলাম একটা ভারী ব্যাগ ছিল। তুই এগিয়ে দিলে সুবিধে হোত। তাছাড়া খোকার আজ যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। এমন কান্নাকাটি করছিল যে বৌমা সামলাতে পারছিল না। শেষে আমি শান্ত করে পাঠাই।'

অভীক কোন উত্তর দিল না। বুঝল, মা বুঝতে পানে নি যে মল্লিকা তার খোকাকে নিয়ে বাপের বাড়ি নয়, চলে গেছে এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে। বুঝতে যখন পারে

নি, সেই মুহূর্তে আর অভীকের ইচ্ছে করে নি মার ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে।

সেই ভুল এই কয় মাসেও আর ভাঙ্গাতে পারে নি। একদিন তো ভাঙ্গাতে হবেই। তাই অভীক আজ বলেই ফেলল, 'তোমার বৌমা আর আসবে না। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আমার বিরুদ্ধে ডাইভোর্সের মামলা শুরু করবে।'

কথাটা বিনোদাদেবী ঠিক বুঝতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। কোন উত্তর না করায়, অভীকও আর কথা বাড়াল না।

পরদিন সকালে অভীক একটু দেরীতে উঠল। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই চিন্তা করতে লাগল কালকে মা ডাইভোর্সের কথাটা শুনে চুপ করে গেলেও আজকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে। 'অভী, তোদের মধ্যে এত কি মনোমালিন্য হলো যে বৌমা ডাইভোর্স করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল?'

অভীক যদি বলে, ' মা মনোমালিন্য নয়। মতভেদ; নীতিগত পার্থক্য; কতকগুলি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই আমাদের দুজনকে ডিভোর্সের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মা কি সে কথা বুঝতে পারবে? মাকে যদি বলা যায়, 'মা তোমার বৌমা এ সংসার করাটাকে মনে করছে বন্ধন। স্বামী পুত্র শাশুড়ীর কাছে দায়বদ্ধতাকে মনে করছে নারীত্বের অবমাননা। মা কি তা বুঝতে পারবে? মাকে যদি বলা যায়, 'মা তোমার বৌমা তোমার ছেলের থেকে কোন অংশে কম নয়। সে-ও অধ্যাপনা করে। ডক্টোরেট, আমার থেকে আগে চাকরীতে ঢুকেছে বলে মাইনে বেশি পায়; তাই—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মা হয়তো বলে উঠবে, তাই পতি যে স্ত্রীর পরমগুরু একথাটা অস্বীকার করার অধিকার অর্জন করেছে? মা হয়তো বলবে, 'অভী, আমাদের সময় তো এত অশান্তি ছিল না। তখন শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-ভাসুর-দেওয়রের মধ্যে থেকেও আমরা তো বন্ধন মনে করি নি। তোমাদের মত আমাদের সময় বন্ধন আর মুক্তি, মান এবং অপমান-এর পার্থক্য বোধটা এত সূক্ষ্ম বিচার করে ধরা হোত না।'

অভীক হয়তো বলবে, 'হোত না বলেই তোমাদের সমস্যা ছিল না। সমস্যা বেশি না থাকাতেই ছিল শান্তি।'

কতক্ষণ আর শুয়ে থাকা যায়। অভীক গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। মুখ চোখ ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে কাগজটা নিয়ে বসেছিল। মা কাছে এসে দাঁড়াতে অভীক বলল, 'কিছু বলবে?'

বিনোদাদেবী বললেন, 'অভী আমাকে বরং দেশের বাড়িতে দিয়ে আয়।'

অভীক জিজ্ঞেস করল 'কেন? এই সময় কি তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও?'

—'না, না, তোকে ছেড়ে আমি যাব কোথায়? পাঁচটা সন্তানের পর তুই আমার একমাত্র সন্তান। তোর ছেলে খোকাকে নিয়েই আমি বেঁচেছিলাম। তুই বাইরে গেলে এই শূণ্য ঘরে কেমন যেন খাঁ খাঁ করে। তাই বলছিলাম বৌমা যদি আমার উপরে রাগ করেই চলে গিয়ে থাকে, তবে আমি দেশের বাড়ি গিয়ে থাকি। আমি দেশে চলে গেলে হয়তো বৌমা ফিরে আসবে?'

অভীক সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল,—ওখানে গেলেও কি সুমনের কথা মনে পড়বে না?'

—'পড়বে। তবে অনেকের সাথে মিলে মিশে থাকতে গিয়ে কিছুটা হয়তো লাঘব হবে।

—'ঠিক আছে। তুমি গুছিয়ে নিও। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই তোমাকে রেখে আসব।'

সপ্তাহ খানেক বাদে মাকে দেশের বাড়িতে রেখে এলো অভীক। প্রথম-দু-একদিন বাড়িটা বড় খালি লাগছিল। মল্লিকা সুমনকে নিয়ে চলে গেল, মা-ও এখন নেই। ফাঁকা বাড়িতে শুধু সে একা। তবে শূন্যতাবোধ মাত্র দু-একদিনের জন্যেই। তারপরেই অভীক ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজের মধ্যে। দ্বিগুন-উৎসাহের সাথে মনকে সে বোঝাল সে একজন দর্শনের অধ্যাপক। ভারতীয় দর্শন যার পড়া আছে তার মধ্যে তো শুন্যতাবোধ থাকা উচিত নয়। তার মধ্যে থাকবে পূর্ণতা। তাছাড়া সে একজন সাম্যবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী। রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সাথী আসবে, যাবে, আবার নতুন করে আসবে। তার জন্যে তো মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না।

বিমলা নামে মাঝবয়সী যে মহিলাটি বাড়ির কাজ করে দিত অভীক তাকে রেখে দিল। একবার ভেবেছিল তাকে ছাড়িয়ে দেবে। একার জন্যে কি আবার একটা লোককে রাখবে? আবার ভাবল তারও তো রুটি-রোজগারের ব্যাপার। তাই বিমলাকে ডেকে বলল, মাসি, এবার থেকে প্রতিদিন সকাল বেলা এসে আমার জন্যে রান্না করে ঘর দোর মুছে চলে যেও। আগে যেমন সারাদিন থেকে রাতে যেতে এখন থেকে তা আর করতে হবে না। কেন না রাতে আমি কখন কি ফিরব তার ঠিক নেই। তাই তোমার অতক্ষণ বসে থাকার দরকার নেই। তোমার ভয় নেই একবেলা কাজ করাচ্ছি বলে তোমার মাইনে কমিয়ে দেব তা নয়। যা তোমার মাইনে তাই দেব। শুধু একটু দেখে শুনে নিজের মত করে কাজটা করে দিও।'

মাসির তো খুশি হবারই কথা। কম কাজ করেও আগের মতনই মাইনে পাবে।

* * * * *

গড়িয়ার হাউজিং কম্‌প্লেক্সের ফ্ল্যাট-টা মল্লিকার এক বান্ধবীর নামে। বান্ধবী যখন ফ্ল্যাটটা কেনে তখন মল্লিকা কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। বান্ধবী কিছুদিন ঐ ফ্ল্যাটে থেকে অন্য একটা ভাল ফ্ল্যাট পেয়ে চলে যায়। তারপর থেকে খালি পড়েছিল। এই সময়েই মল্লিকার অসুবিধের কথা শুনতে পেয়ে বলেছিল 'তুই যদি সত্যিই চলে আসা মনস্থির করে থাকিস তবে, আমার ফ্ল্যাটটা এখনও ভাড়া দিই নি। তুই এসে থাকতে পারিস।'

মল্লিকা বলেছিল, 'ভাড়া হিসাবে এখন আসছি। কিন্তু পরবর্তীকালে বিক্রি করলে তুই আমার কাছেই করিস।'

বান্ধবীটা হেসে বলেছিল, 'সে পরের কথা।'

কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে মল্লিকার বাপের বাড়ি। তেতলা। আইনত একটা তলা মল্লিকা দাবী করতে পারে। কিন্তু করবে না। এই দশ বছরে ঠাকুমা আর বাবা মারা গেছে। ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই-এরও বিয়ে হয়েছে। ওরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মল্লিকা কারোরই সাহায্য নিতে চায় না। তবু ফ্ল্যাটে চলে আসার পর কিছুদিন মাকে এনে রেখেছিল। সব সময়ের জন্যে যে কাজের লোকটি রেখেছিল সে কতটা বিশ্বাসী তা একটু দেখে নেওয়ার পরে মা ফিরে গেছে আবার ভাই-এর কাছে।

মল্লিকার এই চলে আসটা মা-ও ঠিক মেনে নিতে পারে নি। তবে তিনি তার বড়মেয়েকে চেনেন। বড় এক রোখা, জেদী মেয়ে। নিজে যা ভাল বুঝবে তা থেকে তাকে সরানো যাবে না। তাই তিনি তাকে ঘাটাতে চান নি। মল্লিকা একদিন মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেছিল, ' তোমাদের ধারনা অভী খুব ভালো ছেলে। তা মোটেও নয়। মুখে প্রগতির কথা বললেও মনে মনে সে প্রচণ্ড সংস্কারাচ্ছন্ন। আষ্টেপৃষ্টে আমাকে বাঁধতে চেয়েছিল। যা আমার কাছে অসহ্য। নিজে বাড়িতে দেরী করে ফিরলে দোষ নেই। অথচ আমি বাড়িতে রাত করে ফিরলে একটা অসন্তোষ, একটা নীরব জিজ্ঞাসার চাউনি। যা, কথা বলা থেকেও কষ্টকর।

সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই সে বুঝিয়ে দিতে চায় স্ত্রী মানে 'সাব অর্ডিনেট' থাকবে। তার স্বামী মানেই 'ডমিনেট' করবে। এ জিনিস আমার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর। তাই একই ছাদের তলায় থেকে আমরা একটু একটু করে পরস্পর দূরে সরে গিয়েছিলাম। এভাবে থাকা যায় না। তাই আমি সরে এসেছি ছেলেকে নিয়ে।'

মল্লিকার মা কোন উত্তর দেয় নি।

দুদিন ছুটিতে থেকে নতুন সংসারটা গুছিয়ে নিয়ে মল্লিকা আবার কাজ শুরু করেছিল, কলেজ যাওয়া, পার্টির কাজ করা। সুমন চলে গিয়েছিল কাজের মাসির তত্ত্বাবধানে। ছোট্ট

সুমন প্রথম কিছুদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখানে আমরা কতদিন থাকব? আমার ভাল লাগছে না। বাড়ী চল।'

মল্লিকা ধমক দিয়ে বলেছে, 'এটাই আমাদের বাড়ি এখন থেকে এখানেই তোমাকে থাকতে হবে।'

সুমনের কেমন গুলিয়ে যায়। উত্তর দেয় না। মাঝে মাঝে রাতে উঠে সে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে।

পার্টি সম্পাদক মিহির দত্ত আর একবার চেষ্টা করেছিলেন মল্লিকা আর অভীককে একই টেবিলে বসিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু সফল হন নি। পরে দেখেছিলেন তারা বিচ্ছিন্ন থাকাতে দুজনেই বেশি করে মনোনিবেশ করেছে পার্টির কাজে। তাই তিনি আর গরজ দেখান নি।

ওরা দুজনেই অধ্যাপক সমিতির সাথে যুক্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আগে যেমন দেখা হোত দুজনার, এখনও সে রকম দেখা হয়। দেখা হলে কথাও বলে। কিন্তু দুজনেই এখন দুজনের থেকে বহু দূরে।

* * * * *

প্রায় ছয় মাস হোল অভীক মাকে দেশে রেখে এসেছে। প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন অনেকের মধ্যে থাকার ফলে বিনেদাদেবীর চিন্তাটা একটু কম ছিল। কিন্তু কিছু দিন যাওয়ার পব দ্বিগুন হয়ে ফিরে এল। বৌমা, বিশেষ করে নাতির চিন্তার সাথে যুক্ত হয়েছে ছেলে অভীর চিন্তা। কলকাতায় কলেজে পড়তে যাওয়া থেকে অভী কাছ ছাড়া ঠিকই। কিন্তু এখন অভীকে একলা ফেলে রেখে এসে, বিনোদাদেবীর যেন বারবার অপরাধী মনে হচ্ছিল। যখন হোস্টেলে ছিল বা মেসে ছিল তখন এক রকম ছিল। এখন বিয়ে করেছে। ছেলে হয়েছে। নিজেদের বাড়ি। সাজানো সংসার হয়েছে হঠাৎ আবার শূন্যতা—কে জানে ছেলেটা কি করছে—কি খাচ্ছে কখন বাড়ি ফিরছে। বিনোদাদেবী ভেবেই পাচ্ছে না দশ বছর সংসার করার পর বৌমার এতদিনে মনে হলো সে নিপীড়িত? অপমানিত? এখান থেকে চলে না গেলে তার মুক্তি নেই? বিনোদাদেবী এরই মধ্যে দু তিনবার লোক মারফত অভীককে খবর পাঠিয়েছেন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অভীক বার বারই বলে পাঠিয়েছে একটা কাজের ব্যাপারে এখন সময় পাচ্ছে না। তবে কয়েকদিনের মধ্যে গিয়ে নিয়ে আসবে।

কাজ মানে তো পার্টির কাজ। নিজের কাজে আর কতটুকু সময় ব্যায় করে? তবে আজকাল কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা চিন্তা অভীকের মাথায় ঘুরে বেড়ায়। ভাবে চারিদিকে এই নারীমুক্তি, নারী প্রগতির কথা শোনে এর আসল মানেটা কি? নারীর কোন কাজে বাধা থাকবে না। নারীর হাতে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা থাকবে। এটাই কি নারী মুক্তির

একমাত্র সোপান? নারীর মধ্যে এই যে পুরুষের থেকে বেশি দয়া, মায়া, সহ্য শক্তি, এ কি শুধুই দুর্বলতার কারণে? অভীক মাঝে মাঝে অধ্যাপক বন্ধু সমীরের সাথেও আলোচনা করে।—'আচ্ছা সমীর তোর কি ধারণা নারীরা অর্থনৈতিক দিকে থেকে স্বনির্ভর হলেই একমাত্র নারীমুক্তি সম্ভব, তা না হলে নয়?'

সমীর উত্তর দেয়, 'অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো বটেই। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা বা তাদের মায়েরা যে কষ্ট পেয়েছে তা প্রধানত তারা অর্থের দিক থেকে পুরুষ নির্ভর বলেই।'

অভীক উত্তর দেয়, 'সাংসারিক প্রয়োজনে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় নারী মুক্তির এটাই প্রধান পথ নয়।

সমীর উত্তর দেয়, ' সেটা ঠিকই। প্রথম কথাই হচ্ছে শিক্ষার আলো বেশি করে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আর মেয়েরা গৃহস্থলী ও সন্তান প্রতিপালনের যে কাজ করছে তাকেও একটা কাজ বলে স্বীকৃতি দেয়া, তাদের কাজও যে পুরুষের রোজগারের থেকে কোন অংশে কম গুরুত্ব নয়, এটাই উপলব্ধি করা।'

অভীক বলে, 'ঠিকই বলেছিস। আসলে দরকার একটা চিন্তা ধারার পরিবর্ত্তন। চারদিকে এই যে দেখি বধু নির্যাতন, ধর্ষণ, বলাৎকার—এসব দেখে মনে হয় পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক যেন সব সময় শোষক আর শোষিতের বা আর একটু খারাপ ভাবে বলা যায় খাদক আর খাদ্যের। এই দৃষ্টিভঙ্গিরই চাই পরিবর্ত্তন করা। তারাও যে পুরুষের থেকে কোন অংশে কম নয়, এ ধারণা যত দিনে না সবাই মেনে নিচ্ছে ততদিন প্রকৃত নারী মুক্তি সম্ভব নয়।

আলোচনা করতে করতে 'অফ্ পিরিয়ড' শেষ হয়ে যায়। আবার যে যার ক্লাশে পড়াতে যায়।

আট মাসের বেশি হয়ে গেল মল্লিকা আলাদা হয়ে গেছে। মল্লিকা যখন অভীকের কাছে ছিল তখনও এই নারী মুক্তি, নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হোত। আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত শেষ হোত মতানৈক্যে। কোন সময়েই একমতে এসে শেষ হোত না। অভীক স্বীকার করত সমাজের অর্দ্ধেক যখন নারী, তখন নারীদের উন্নতি ছাড়া সমাজের উন্নতি কখনও সম্ভব নয়। এমন কি নিজে ধর্ম বিষয়ে নিরাসক্ত হয়েও শ্রী রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলত, মহামায়া হচ্ছে শক্তিরূপিনী। তাই তাদের বাদ দিয়ে শক্তি পূজোর পূর্ণতা আসতে পারে না। কিন্তু তবু অভীক মনে করত নারী হবে নমনীয়, কমনীয়, স্থিতধী। তার থাকবে একটা 'সাবমেসিভ্ এ্যাটিচিউড্' যা কখনও-ই পুরুষের অন্যায় আচরণের কাছে নতিস্বীকার নয়। মল্লিকার সাথে বিরোধ এখানেই। তার

মতে ওসব কথার বুলি ছড়িয়ে প্রকারান্তরে নারী নির্যাতনকে সমর্থন করা। অতীতে সমাজ ব্যবস্থায় গৃহশান্তির যে কথা বলা হয়ে থাকে তা আসলে নির্যাতিত নারীর প্রতিবাদ করার অবস্থা একেবারেই ছিল না। তাই এক পক্ষ কাটাতো সুখে শান্তিতে, অন্য পক্ষের চাপা ক্রন্দন কখনও প্রকাশ পেত না। এ ছিল শ্মশানের শান্তি । দুজনের মধ্যে মতানৈক্য হলেও অভীক কখনও মনোমালিন্যের স্তর পর্য্যন্ত নিয়ে আসত না। কিন্তু মল্লিকা যখন 'আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ছলে চলে গেল তখন যেন নিজের পৌরুষের উপরে তার আঘাত লাগল। একটা চাপা ক্ষোভ বা রাগ গিয়ে পড়ল মল্লিকার পরে। মল্লিকার পরে রাগ হলেও সুমনের জন্যে মাঝে মাঝে মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত।

* * * * *

কিছুদিন হোল মা বিনোদাদেবীকে অভীক গ্রাম থেকে কোলকাতার বাড়িতে নিয়ে এসেছে। তিনিও মাঝে মাঝে সুমনের কথা জিজ্ঞেস করে বলেন, 'অভী, খোকার জন্যে বড্ড মন কেমন করে। সে কেমন আছে? মাঝে মাঝে একটু খোঁজ-খবর নিলে কি হয়? ও তো তোর ছেলে। অভীকও মাঝে মাঝে ভেবেছে কার্য্যোপলক্ষে তো মল্লিকার সাথে প্রায়ই দেখা হয়, দু-চারটে কথাবার্তাও হয়। সুমনের কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। আবার কি ভেবে থেমে যায়। একদিন জিজ্ঞেস করে ফেলল, ' সুমন কেমন আছে, বলতে পার?'

মল্লিকা উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ পারি। আমার কাছে যখন আছে, তখন বলতে পারা উচিত কেমন আছে: তবে তোমার যদি খুব ইচ্ছে থাকে আমার বাসায় গিয়ে দেখে আসতে পার। তাতে তো বাধা দিই নি। কারণ ছেলে তো তোমারও।'

মল্লিকার কথা শুনে অভীকের মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে গেল। বলল, 'হ্যাঁ। সুমনের খোঁজ নিতে তোমার বাসায় যেতে আমার আপত্তি নেই। তবে এখন নয়। 'ডাইভোর্সের' মামলার রায়টা জানার পরে। যদি সুমনের দায়িত্বে আমাকে দেয় তবে নিয়ে আসব। যদি তোমার ওখানে রাখার কথা বলে তখন নিজে থেকেই আমি বলব ওর সমস্ত খরচ খরচা আমি বহন করতে রাজি। তখন তোমার ওখানে গিয়ে তাকে দেখে আসব।'

মল্লিকা বলল, 'ডাইভোর্সের মামলা শুরু করলেও অত সহজে তা নিষ্পত্তি হতে দেব না। তুমি ভেবেছ 'ডাইভোর্স' করেই আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে তার উপর অত্যাচার শুরু করবে?'

অভীক বলল, 'তার জন্যেই কি মামলা শুরু করতে এত সময় নিচ্ছ? তুমি শুরু না করলে আমিই হয়তো শুরু করব।'

মল্লিকা বলল—'তোমার শুরু করতে হবে না। আমিই আরম্ভ করব। তুমি দু'একদিনের মধ্যেই নোটিস পাবে।'

দু-একদিন দূরে থাক আরও দু-তিন মাস চলে গেল। তবু অভীক কোন নোটিস পেল না। এই অবস্থাটা দিনকে দিন অভীকের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। বিবাহিত স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অথচ আপাত গ্রাহ্য কোন কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না। এই অপমানটা প্রতিনিয়ত তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের অহেতুক উৎসুক্য। একটার পর একটা প্রশ্নে প্রায়শঃই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কেউ কেউ সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে ইতস্ততঃ বোধ করে, কিন্তু তাদেরও কথা বার্ত্তার ধরন আর চোখে মুখের ভাব দেখলে অভীক বুঝতে পারে, তাদেরও জিজ্ঞাসা ' কেন চলে গেল?' অভীকের সহজ সরল উত্তরে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে চায় না। বিশেষ করে এখন নারী প্রগতির যুগে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্বে লোকে ধরেই নেয় নারীই হয়েছে নির্যাতিত। অভীক তাই দীর্ঘদিন ধরে এই দোটানায় চলার থেকে ঠিক করল ও-ই ডাইভোর্সের মামলাটা ফাইল করবে। ডিভোর্স হয়ে গেলে তখন বলা যাবে মতের মিল হোল না কিছুতেই। তাই ডিভোর্স হয়ে গেল। আজকাল তো একরকম অনেকেরই হচ্ছে। দু একদিন দেখে এক উকিল বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে অভীক মামলাটা 'স্যুট'-ও করে দিল।

* * * * *

সুমনকে নিয়ে মল্লিকা চলে গেলেও বিনোদাদেবী প্রতিদিনই ভাবতেন, বৌমার বোধহয় রাগ পড়ে যাবে। ছেলেকে নিয়ে কালই হয়তো চলে আসবে। কিন্তু মাসের পর মাস চলে গেলেও বৌমা এলো না। শেষে একদিন শুনতে পেলেন অভীকই ডাইভোর্সের মামলা শুরু করেছে। কথাটা শুনে তিনি আরও যেন ভেঙ্গে পড়লেন। তাহলে সত্যিই বৌমা আর খোকাকে নিয়ে আসবে না! একটাব পর একটা কত চিন্তা মাথার মধ্যে দিয়ে খেলে গেল। শেষ মেশ ছেলে অভীককে নিয়েই তার চিন্তা বেড়ে গেল। ছোটবেলা থেকেই ঘর ছাড়া বাউন্ডুলে ছেলে। যদিও বা সংসার শুরু করল তা-ও টিকল না। এরপরে তো আবার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। কারও কথা কি আর শুনবে?

ডাইভোর্সের মামলা যে অভীকই শুরু করে দেবে মল্লিকা তা ভাবতে পারে নি। মল্লিকা ভেবেছিল অভীককে কিছুদিন মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রেখে তবে মামলাটা শুরু করবে। আবার এ-ও ভেবেছে ছেলের উপর তো অভীকের খুব দুর্বলতা। সেই টানেই হয়তো একদিন সব ছেড়ে দিয়ে মল্লিকার বাসায় এসে উঠবে। মল্লিকার কর্ত্তৃত্ব যদি এভাবে মেনে নেয় তবে মামলা শুরু নাও করতে পারে। কিন্তু দুটোর কোনোটাতেই অভীককে

জব্দ করা গেল না। উপরন্তু নোটিশ দেওয়ার পরিবর্ত্তে নোটিস হাতে আসায় মল্লিকা যেন আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রাগে ভিতরটা গজ গজ করতে করতে ঠিক করল,— অভীককে ফোন করবে। বলবে, তোমাকে ধন্যবাদ মামলাটা শুরু করার জন্যে। কিন্তু অভীককে তো বাড়িতে রাত এগারোটার আগে পাওয়া যায় না। তাই রাগ চেপে রেখেই এগারোটা নাগাদ ফোন করল, ' নোটিশ পেয়েছি। তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু মনে ভেব না তাড়াতাড়ি তুমি কেসটা তোমার ফেবারে নিয়ে গিয়ে রায় বের করবে। আমি যতদিন পারব 'লিঙ্গার' করে 'কেসটা' ঝুলিয়ে রেখে দেব।'

অভীক কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে ধীরে ধীরে বলেছিল, 'আইনের পথ তো তোমার আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে চলে না। সে তার নিজের পথে চলেই রায় দান করবে। এ কথা তোমার অন্ততঃ অজানা নয়।'

মল্লিকা আর কথা বাড়ায় নি। ঠক্ করে ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল।

* * * * *

ইদানীং অভীক কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কথাবার্ত্তা বিশেষ বলে না। যা কাজ নীরবেই সমাধা করে। পার্টি অফিসে যেমন যেতো এখনও নিয়মিতই যায়। পার্টি যা যা কাজের দায়িত্ব দেয়;তা সুষ্ঠভাবে পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু আগের মত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটাই কমে গিয়েছিল। এখন সময় পেলে পড়াশোনাতে ডুবে থাকে। বাড়িতে এখন অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়াশোনা করে। ছুটির দিনে অথবা কলেজের পরে প্রায়ই চলে যায় ন্যাশ্যানাল লাইব্রেরীতে। নিজের বিষয় দর্শনের উপর প্রকাশিত নতুন নতুন বইগুলো পড়ে। আবার দর্শনের বহুবার পড়া পুরোনো বইগুলো নতুন করে পড়তে শুরু করেছে। চেষ্টা করে সেগুলোর উপরে নতুন করে কিছু আলোকপাত করা যায় কিনা। কলেজের যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা তার কাছে বাড়িতে পড়তে আসত তারা পড়ে গেল মুশকিলে। এমনিতেই স্যারের পড়ানোর নির্দ্দিষ্ট কোন সময় বা দিন কোনদিনই ছিল না। স্যার যেদিন যে সময় বলে দিত তারা সেদিনই সে সময় আসত পড়তে। এখন স্যার আরও যেন অনিয়মিত হয়ে পড়ছেন। আসলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়িয়ে টাকা আয় করার ঘোরতর বিরোধী অভীক। কিন্তু এখন রেওয়াজ হয়ে গেছে শুধু স্কুলে নয় কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়লেও, পড়তে হবে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। গুচ্ছের টাকা পয়সা বেরিয়ে যায় এক একটা ছেলে মেয়ের পেছনে। গরীব ঘরের ছেলে মেয়েরা যে কোথায় যাবে? অভীকের নরম মন ওদের জন্যে খুব 'ফিল' করে। তাই প্রতিবছরই সে একজন-দু-জন করে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বেছে নেয়। যারা মেধাবী হয়েও দারিদ্র্যের জন্যে ঠিক মত পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের ও চেষ্টা করে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করতে। আর মাঝে মাঝে

বাড়িতে ডেকে নিয়ে জটিল বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতে। আজকাল বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যায়। অভীক মনে মনে ভাবে ওদের যেদিন পড়ানোর ' ডেট' দেবে সেদিন অন্ততঃ আগে আগে ফিরবে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। ফিরতে ফিরতে সেই রাতই করে ফেলে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে যায় অসুবিধায়। স্যারের কাছে পড়া বুঝে বাড়ি যেতে রাত হয়ে যায়। অভীক অবশ্য কিছুটা ওদের এগিয়ে দেয়। তবু দিনকাল ভাল নয়, অভীকের একটা চিন্তা থেকে যায় মনের মধ্যে। পরের দিন ক্লাশে ওদের না দেখলে খোঁজ নেয় তারা এসেছে কিনা। ফিলসফি অনার্সের সেকেন্ড ইয়ারে ছাত্রী সুলেখার বাড়ি সবার থেকে একটু দূরে। কিছুটা বস্তি এলাকার মধ্যে। তাকে একদিন অভীক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল, সুলেখা এক কাজ কর, তোমাদের বাড়িটা আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। আর জায়গাটাও ভাল নয়। তোমার আর এখানে এসে এত রাত পর্য্যন্ত বসে থেকে পড়ে যেতে হবে না। আমি বরং সময় করে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসব। তবে কোন নির্দিষ্ট সময় ধরে যেতে পারব না। যেদিন যখন সময় পাব আগে থাকতে বলে দিয়ে তোমাদের বাড়ি চলে যাব। তোমাকে অবশ্য সে সময় বাড়িতে থাকতে হবে।

কথাটা শুনে সুলেখা প্রথমে ভাবতে পারে নি যে স্যার তাদের বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসবে। একটু ধাতস্থ হয়ে ভেবেছে এটা অভীক স্যারের পক্ষেই সম্ভব। কত দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছরই তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে ভাল রেজাল্ট করে পাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার নিজের কথাটাই ধরা যাক। বাবা সিনেমা হলের একজন কর্মচারী। কত টাকাই বা মাইনে পায়। তার উপরে মাঝে মাঝে কর্মী আন্দোলনে বন্ধ থাকে। তখন কোন আয় নেই। দুই বোন এক ভাই-এর ওই বড়। বাড়ি বলতে ওয়াটগঞ্জের বস্তি এলাকায় এক চিলতে দখল করা জমির উপর ছোট একটা টালির বাড়ি। ঐখানকার মেয়ে সুলেখা যে 'ফিলসফি অনার্স' নিয়ে নামী কলেজে পড়বে ভাবাই যায় না। আসলে ওরা তিনটে ভাই বোনই পড়াশোনায় খুব ভাল। মা লক্ষ্মী সদয় না হলে কি হবে, মা সরস্বতী ওদের ভাই বোনদের প্রতি খুব সদয়। সুলেখার স্কুল-ফাইনাল আর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার ফল খুবই ভাল হয়েছিল। তাই সরকারী স্কলারশীপ নিয়েই ভর্তি হয়েছিল কলেজে। ওর পরের ভাইটাও বেশ ভাল ভাবে স্কুল ফাইনাল পাশ করে ভর্ত্তি হয়েছে এগারো ক্লাশে। বার ক্লাশ পাশ করার পরে সুলেখা কলেজে ভর্তি হয়ে ছিল ঠিকই। কিন্তু মা তারাদেবী একবার ভেবেছিলেন এবার হয়তো ওর বাবা দেবেশবাবু মেয়ের পড়া চালাতে চাইবে না। চালানোর সামর্থ্যও ছিল না। তবু সুলেখার পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে দেবেশবাবুই 'না' করেন নি। দেবেশবাবু তার ছাত্রবস্থায় সাংসারিক চাপে কলেজে পড়ার সুযোগ পান নি। কিন্তু তার মনটা ছিল বেশ পরিশীলিত। সংস্কৃত পণ্ডিত বাবার কাছ থেকে বেদ-পুরাণ-উপনিষদের পাঠ নিয়েছিলেন। সুলেখা যখন ছোট ছিল তখন বাবার কাছ থেকে

উপনিষদের নানা গল্প শুনত। সেই সব শুনে শুনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে জানার একটা আগ্রহ তার জন্মে যায়। তাই ভাল রেজাল্ট করে যখন স্কুল ফাইনাল পাশ করল, তখন অনেকেই বলেছিল সাইন্স নিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু সুলেখার এক কথা ও আর্টস নিয়ে পড়বে। আর ডিগ্রিতে ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে পড়বে। তাই পরবর্ত্তীকালে ভর্ত্তিও হয়েছিল ফিলসফি অনার্স নিয়ে নামী কলেজে। কিন্তু ভর্ত্তি হওয়ার কয়েক মাস বাদেই বাবার চাকরীস্থল বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম প্রথম ভেবেছিল এ-রকম দু-তিন দিন প্রায়ই হয়। আবার গণ্ডোগোল মিটেগিয়ে সিনেমা হল খোলে। কিন্তু এবার শ্রমিক সঙ্কট আরও জটিল হয়েছে। ফলে সিনেমা হলটা উঠে যাওয়ারই আশঙ্কা দেখা দিল। পরে অবশ্য খুলেছিল কর্মী ছাঁটাই হয়ে, মাইনে কমিয়ে যাকে বলে মুচলেকা দিয়ে। বাবার চাকরীর যেখানে এই অবস্থা সেখানে সুলেখা প্রফেসার রেখে পড়ার কথা ভাবতেই পারে নি। এমনকি সব বই খাতাই কিনে উঠতে পারল না। পড়ার খরচ চালানোর জন্যে সুলেখা অনেকদিন থেকেই টিউশনি করা শুরু করেছিল। কিন্তু সেই টাকায় পড়ার খরচ চালানোটা হয়ে উঠল গৌণ। তার থেকে সংসার চালানোর জন্যে বাবার হতে কিছু টাকা তুলে দিলে তবু দু-মুঠো অন্ন জোটে। এভাবে কয়েকটা মাস চলল। আর যে চলতে চায় না। হাসি খুশি মিশুকে মেয়েটা কেমন যেন ম্রিয়মান হঁয়ে যেতে থাকল। কয়েকদিন লক্ষ্য করে কলেজের বন্ধুরা সুলেখাকে একদিন ধরে বলল, ‘ তোর কি হয়েছে বলত সুলেখা? নিশ্চয়ই প্রেম করতে গিয়ে ল্যাং খেয়েছিস?’ নামী কলেজ। অধিকাংশই বড় লোকদের ছেলে-মেয়েরা পড়ে। কিছু কিছু হতো গরীব ঘরের মেয়েরা পড়ে। কিন্তু সুলেখাদের অবস্থা তাদের থেকেও খারাপ। বন্ধুদের হাসি-ঠাট্টাটা সুলেখার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে আরও বেদনাদায়ক করে তুলল। শেষে দু-তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাংসারিক অবস্থাটা বর্ণনা করে বলেই ফেলল, ‘আর হয়তো পড়াশোনাটা চালিয়ে উঠতে পারব না।’

কলেজের বারন্দার করিডোরে দাঁড়িয়ে সবাই কথা বলছিল। বন্ধুদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘পড়াশোনা তোর বন্ধ করতে হবে না। তুই এক কাজ কর। অভীক স্যারকে সব কথা জানা। দেখবি উনি একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন। অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে তা সে যে কলেজেই পড়ুক না, তিনি বই দিয়ে, কখনো বা বিনা পয়সায় বাড়িতে পড়িয়ে সাহায্য করে থাকেন। তুই বরং অভীক স্যারের কাছে যা।’

একটু আগেই ঘন্টা পড়েছিল। ক্লাশরুম থেকে প্রোফেসার্স রুমে যাওয়ার পথে কথাটা অভীকের কানে গিয়ে পৌছালো। অভীক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুব জনপ্রিয়। কথাটা শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, ‘আরে অভীক স্যারের কাছে যেতে হবে কেন? অভীক স্যারই এসে গেছে তোমাদের কাছে। বল, কি বলছিলে?’

যে বন্ধুটি কথাগুলো বলছিল সে একটু লজ্জায় পড়ে গেল। তবু নিজেকে সামলে

নিয়ে বলল, 'এই সুলেখার একটা প্রবলেমের কথা আপনাকে বলতে বলছিলাম।'

সেই থেকে শুরু। সুলেখার পড়াশোনার আগ্রহ দেখে পুরো ব্যয় ভারটা অভীক বহন করেছিল। বাড়িতেও পড়তে আসতে বলেছিল। ওদের ইয়ারের আরও দু-একটা ছেলে মেয়ে পড়ে, তাদের সাথে। পার্ট ওয়ানে বেশ ভাল নম্বর নিয়েই পাশ করেছিল সুলেখা। পার্ট-টু পরীক্ষা দেওয়ার কয়েক মাস আগেই অভীকের পারিবারিক জীবনে দেখা দিল অশান্তি। মল্লিকা চলে যাওয়ার পর অভীক ঠিক মতন ওদের আর সময় দিতে পারছিল না। অথচ পার্ট-টু পরীক্ষার আগে ওদের ছেড়ে দিলে ওরা খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। যারা পড়ত তাদের মধ্যে সুলেখার বাড়িটা ছিল দূরে। বেশি রাত পর্যন্ত বসে থেকে অভীকের কাছে পড়ে বাড়ি ফিরতে তার খুব অসুবিধে হচ্ছিল। তাই অভীক একদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই বলেছিল 'সুলেখা তোমার আর আমার বাড়িতে এসে পড়ে যেতে হবে না। আমি সময় করে তোমাদের বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসব।'

সুলেখা ভাবতেই পারে নি যে স্যার এতটা করবেন।

* * * * *

দিন যায় মাস যায়। দেখতে দেখতে দুবছর কেটে গেল। অভীক আর মল্লিকার ডাইভোর্সের মামলাটা এখনও নিষ্পন্ন হয় নি। মল্লিকা উকিল মারফত কায়দা করে দীর্ঘদিন বাদে বাদে শুনানির 'ডেট' ফেলত। যেদিন তারিখ থাকত কোর্টে ওঠার আগে অভীক ও মল্লিকার দেখা হলে যথারীতি পরস্পর সৌজন্য বিনিময় করত। কিন্তু কোর্টে উঠলেই মল্লিকা হয়ে যেতে আলাদা মানুষ। একবার অভীকের উকিল জেরা করার সময় বলেছিল, 'মল্লিকাদেবী আপনি কি চান মনস্থির করুন। আপনি 'ডাইভোর্স' চান না অথচ অভীকবাবুর সাথে ঘর করতেও চান না।'

মল্লিকা দৃঢ়তার সাথেই বলেছিল, 'না চাই না। কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলাই চাইবে না।'

উকিল বলেছিল, 'বিবাহিত জীবন যাপন করলে নারী তার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় বা যদি আপনার মনে হয়, তবে 'ডাইভোর্সের মাধ্যমেই তো আপনি নিজেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদার ধ্বজা আকাশে উড়িয়ে ধরতে পারেন।'

মল্লিকার উকিল সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলেছিল 'ধর্মাবতার, আমার মক্কেল সম্মানিত ব্যক্তি। প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিদ্রূপ বান নিক্ষেপ করা ঠিক হচ্ছে না।'

সময় পেরিয়ে যাওয়ায় সেদিনকার মত শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

* * * * *

বিনোদাদেবীর শরীরটা কিছুদিন ধ'রে ভাল যাচ্ছিল না। বয়স হয়েছে, আজ বাতের কষ্ট তো অন্য দিন ঠান্ডার প্রকোপে সর্দি-কাশি-শ্বাস কষ্ট লেগেই থেকেছে। তারপর বৌমা আর নাতি চলে যাওয়ায় মনটা একেবারে ভেঙ্গে গেছিল। কাজের বৌ বিমলা প্রায়ই বিনোদাদেবীকে বলত, 'মাসিমা দাদাবাবুকে আর একবার বিয়ে দাও। ও রকম তেজিয়াল বৌ কোনদিন ঘর করতে পারে না। একটা নরম সরম দেখে ঘরোয়া মেয়ে নিয়ে এসো।'

বিনোদাদেবী বলেন, 'আমার কথাতেই কি অভী বিয়ে করবে? ও যা জেদী এক রোখা ছেলে। নিজে যদি বোঝে তবেই করবে। আমার কথায় নয়।'

বিমলা বলে, 'তুমি কথাটা পড়ে দেখ না। প্রথম প্রথম হয়তো না বলবে। কিন্তু কানের গোড়ায় বার বার বলতে বলতে এক সময় রাজি হয়ে যাবে।'

বিনোদাদেবী দু-একবার অভীকের কাছে কথাটা উত্থাপন করেছিল। কিন্তু অভীক কোন গুরুত্ব দেয় নি। গুরুত্ব দেওয়ার কথাও নয়। পার্টির কাজে নিজেকে পুরোপুরি জড়ানোর পরে কোনদিন যে সে বিয়ে করবে ভাবেই নি। মল্লিকার সাথে বিয়েটা বলতে গেলে অপ্রত্যাশিত ভাবে চাপিয়ে দেওয়া। চাপিয়ে দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করেছে পার্টির নির্দ্দেশ মনে করে সেটাও সুষ্ঠ ভাবে মানিয়ে নেওয়ার। কিন্তু তা যখন টিকল না। তখন নিজের সুখের জন্যে আবার বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই চায় না। তবু সোজাসুজি 'না' বলে দিলে মা এই অবস্থায় আরও দুঃখ পাবে, তাই কোন উত্তর দেয় নি।

উত্তর না দিলেও কিছুদিন বাদে একটা জিনিস তাকে ভাবিয়ে তুলল। সুলেখা ভালভাবে বি. এ. অনার্স পাশ করে এম. এ. তে ভর্ত্তি হয়েছে। ইতিমধ্যে একবছর পার হয়ে এম. এ. পার্ট ওয়ান পরীক্ষাও দিয়েছে। বলতে গেলে সবটাই অভীকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায়। বাদবাকী যা খরচপত্র লাগত তা সুলেখা টিউশনি করেই নিজের খরচ নিজে চালিয়ে নিত। শুধু নিজের খরচ কেন; এর থেকে বাঁচিয়ে সংসার খরচ চালানোর জন্যে বাবার হাতেও প্রতিমাসে কিছু করে টাকা দিত। কিন্তু তবু তারা বাবা এখন আর তাকে পড়াতে চায় না। যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। দেবেশবাবু যে সিনেমা হলে কাজ করেন তার মালিকের ছেলের বয়স সাতাশ-আঠাস। পথে দু-তিন দিন সুলেখাকে দেখে পিছনে লাগা শুরু করেছিল। সুলেখা কোন পাত্তা দেয় নি। শেষে ছেলেটা একদিন দেবেশবাবুকেই ধরে বসল, সে তার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। দেবেশবাবু জানেন যে মালিকের ছেলেটি ভাল নয়। তবু সরাসরি খারিজ করে দিলে যদি মালিকের কান ভাঙ্গিয়ে চাকরীতে কোন ক্ষতি করে দেয়? তাই তিনি বলেছিলেন, 'কয়েকটা দিন সময়

দাও, মেয়ে আর মেয়ের মায়ের সাথে একটু আলোচনা করে দেখি। তাছাড়া ভেবেছিলেন এইভাবে কিছুদিন 'ডিলে' করলে বখাটে ছেলেটা হয়তো ভুলে গিয়ে অন্য মেয়ের পেছনে লাগা শুরু করে দেবে। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। নানা ভাবে দেবেশবাবুকে রাজি করানোর চেষ্টা করতে ল্যাগল। কখনও ভয় দেখিয়ে, কখনো প্রলোভন দেখিয়ে। অভাব অনটনে জর্জরিত দেবেশবাবু ক্রমে ক্রমে নিজের স্বাভাবিক চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন—ছেলের সূত্র ধরে যদি মালিকের সাথে আত্মীয়তা করা যায় তবে সামান্য টিকিট বেচার চাকরীর থেকে নিশ্চয়ই উপরের পদে উন্নতি হওয়া যাবে। সুলেখার বিয়ের কথাটা তিনি তারাদেবীর কাছে এই ভাবেই উত্থাপন করলেন। তবু কথাটা শুনে তারাদেবী প্রথমে রাজি হন নি। কিন্তু পরে তিনিই রাজি হয়ে সুলেখাকে রাজি করানোর ভার নিয়েছিলেন।

ভাল কলেজে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করে আর অভীক স্যারের সান্নিধ্যে এসে সুলেখার চিন্তা ধারাই গিয়েছিল অনেকটা পাল্টে। সিনেমা হলে মালিকের অপগণ্ড ছেলেকে স্বামীরূপে বরণ করে নিতে সে চিন্তাতেও আনতে পারে নি। প্রথম দিকে হাল্কা ভাবে প্রস্তাব এলেও পরে বাবা-মা প্রবল চাপ দিতে থাকল সুলেখার উপরে। সুলেখা বুঝে উঠতে পারল না এখন সে কোথায় দাঁড়াবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় যাবে? গেলেও কি ওকে ঐ সব গুন্ডার দল সুস্থির হয়ে থাকতে দেবে?—কখনো নয়। হিংস্র হায়নার মত ছিঁড়ে খুঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাই বলে একটা অশিক্ষিত মস্তান ছেলেকে বিয়ে করা তার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। তাতেও তো তার মৃত্যু হবে প্রতিদিন তিলে তিলে। মানসিক এই অবস্থায় সুলেখা প্রায় দিশে হারা। পড়াশোনা করবে কি? মনই বসাতে পারছিল না। অভীক স্যার ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছিল, কাজ দিয়ে গেলে সুলেখা আগে যেমন ঠিক মতন করে দেখাত প্রায় মাসখানেক ধরে সে কিছু দেখাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'স্যার করে উঠতে পারি নি।' অভীক দু-একদিন কিছু বলে নি। কিন্তু সুলেখা এক একদিন এক একটা অজুহাত দেখানোতে একদিন অভীক রেগে গিয়ে বলে ফেলল, 'তুমি কি মনে কর আমার কাছে পড়ে, করুণা করছ? আমি পড়াতে আসি। রূপ দেখতে নয়। এভাবে চললে আমি আর আসব না।'

অভীক স্যারের কাছে এতটা রূঢ় কথা শুনে সুলেখা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ধীরে ধীরে সব কথা অভীক স্যারকে বলে ফেল্‌ল। কান্না জড়িত স্বরেই বলল, 'স্যার, এখন আপনি বলুন আমি কি করব? আমার আত্মহত্যা করে মরা ছাড়া আর কোন পথ নেই।' সবশুনে অভীক বলেছিল, 'আমাকে দুদিন সময় দাও। দেখি কি করা যায়।'

* * * * *

অভীক আর মল্লিকার মামলাটা তখন শেষ পর্যায়ে। পর পর দুটো ডেটে মল্লিকা বা মল্লিকার উকিল কোর্টে হাজির হয় নি। কেন, কি জন্যে বোঝা গেল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জজ্ সাহেব শুনানি বন্ধ করে রায় দানের তারিখ ঘোষণা করে দিলেন। অভীকের ধারণা সেই দিনই হয়তো—ডাইভোর্সের মামলায় সে জয়ী হয়ে যাবে। এরকমই একটা সময়ে সুলেখা তার সমস্যার কথা অভীক স্যারকে জানালো। কেউ বিপদে পড়লে গায়ে পড়ে সাহায্য করার অভ্যেস অভীকের ছোটবেলা থেকেই। সুলেখার কথা শোনার পর তার মাথায় কয়েকটা দিন থেকে ঘুর পাক খাচ্ছিল কি করে তাকে এই উভয় সঙ্কট অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায়। একবার ভাবল ডাইভোর্সের মামলার পরে সে নিজেও তো বিয়ে করে ফেলতে পারে সুলেখাকে। পরক্ষণেই বিপরীত চিন্তায় ভাবল, তার নিজের একটা সন্তান আছে। বয়সেরও পার্থক্য অনেক। সুলেখা যদি রাজি না হয়?

আসলে বস্তিতে বাস করে বিপরীত পরিস্থিতির ভিতর থেকে সুলেখা যে ভাবে উঠে আসছিল। তা দেখে অভীকের বেশ ভাল লাগছিল। অভীকের মনে হয়েছিল মেয়েটির পাশে যদি দাঁড়ানো যায় তবে সে অনেক দূর পর্য্যন্ত এগোতে পারে। আর এ রকম মেয়েকে দিয়েই সে মল্লিকার মত মেয়েদের যোগ্য জবাব দিতে পারবে। তাই দুদিন বাদেই সে 'ডাইভোর্সের' মামলায় জয়ী হয়ে সোজা চলে গেল সুলেখার বাড়ি। কোন রকম ভূমিকা না করে সুলেখাকে জিজ্ঞেস করল, ' তোমার বিয়ের ব্যাপারে বাড়িতে কি এখনও সেই রকম পরিস্থিতিতেই চলেছে?'

সুলেখা কি আর বলবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'পরিস্থিতি দিনকে দিন খারাপই হয়ে যাচ্ছে। যা এখন অবস্থা আমাকে হয় এখানে বিয়ে করতে হবে নয়, নিজের পথ নিজে দেখে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যে যাব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।'

অভীক বলল, 'আজকেই আমি ডাইভোর্সের মামলায় রায় পেয়েছি। আমি যদি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই তুমি রাজি হবে? এখনই আমি উত্তর চাই না। তুমি মনস্থির করে ভেবে দেখ। দুদিন বাদে আমি আবার আসব। প্রথমে তোমার মত পেলে, তবেই আমি তোমার বাবা-মার কাছে প্রস্তাব রাখব।'

দুটো দিন সুলেখা মনস্থির করবে কি, একটা যেন ঘোরের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। এমন প্রস্তাব যে আসতে পারে তা সে ভাবতে পারেনি। ডিভোর্সি, পুত্র আছে, বয়সের ব্যবধান, কোন কিছুই তার ভাবতে ইচ্ছা করল না। এতদিনে মনে হলো কাঙ্খিত ব্যক্তির সে আহ্বান পেয়েছে। যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে জীবন সার্থক করতে পারবে। তাই

দুদিন পরে যখন অভীক সুলেখার মুখোমুখি হোল তখন সুলেখাকে মুখে আর বলতে হোল না। ভাবেই বুঝিয়ে দিল সে পুরোপুরি রাজি।

এর পরের ব্যাপারটা অভীক দ্রুততার সাথে শেষ করেছিল। রায়ের কপি মল্লিকা হাতে পাওয়ার পর আবার কোন ঝামেলা যাতে পাকাতে না পারে তাই বিয়ের পর্বটা সে তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেয়েছিল। সেই দিনই সে দেবেশবাবু আর তারাদেবীকে সুলেখার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিল। দেবেশবাবুর আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না। তবু তার আশা ছিল মালিকের ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে তিনি সাংসারিক অভাব অনটন কিছু লাঘব করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তা হওয়ার নয়। তাই সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হন নি। কিন্তু যখন শুনলেন এই বিয়েতে কোন কিছু তাকে খরচ করতে হবে না। অভীক আক্ষরিক অর্থেই সুলেখাকে এক কাপড়ে নিয়ে যেতে চায়, তখন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। তারাদেবী একটু খুৎ খুৎ করেছিলেন—দো'জ বর। একটা ছেলেও আছে। কিন্তু অশিক্ষিত অপগণ্ড একটা ছেলের হাতে জীবন কাটানোর থেকে সুলেখা যে একজন শিক্ষিত ভদ্র ছেলের হাতে পড়েছে তাতে খুশিই হয়েছিলেন।

বাড়িতে এসে অভীক মাকে সব জানালো। এবারও অপ্রত্যাশিত ভাবে বিনোদাদেবী শুনলেন, যে, অভীক বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। নিজে দেখে শুনে যে বিয়ে দেবেন তা হোল না। তবু সুলেখা সম্বন্ধে অভীকের কাছে সব শুনে বিনোদাদেবী বললেন, 'তুমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ। অসহায় মেয়েটা যদি ভালভাবে বাঁচার সুযোগ পায়, তো ভালই।' ছেলে যে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, তাতে তিনি খুশিই হলেন। মনের আনন্দে রোগ ব্যাধি সব ভুলে গেলেন। তিনি যেন দেহে নতুন বল পেলেন।

অভীক চেয়েছিল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে শুধু সই-এর মাধ্যমেই বিয়ের পর্বটা সারতে। সুলেখা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ আপত্তি করে নি। কিন্তু অভীককে অনুরোধ করেছিল, রেজিস্ট্রি হওয়ার পর ঐ দিন সে যেন তাকে কালীঘাটে নিয়ে যায়। শাখা আর সিঁদুরটা সে ওখানেই অভীকের হাত থেকে পরতে চায়। অভীক হেসে বলেছিল, আচ্ছা তাই হবে।'

* * * * *

বিয়ের ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পর দু-তিন দিন বাদে অভীক একদিন মল্লিকাকে ফোন করল। চলে যাওয়ার পর এ পর্য্যন্ত কোনদিনই অভীক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ফোন করে নি। সুমনের জন্যে মাঝে মাঝে মন খারাপ করত। ইচ্ছে হোত দেখা করে।

কিন্তু ডাইভোর্সের আগে মল্লিকার বাড়িতে গিয়ে সুমনের সাথে দেখা করলে মল্লিকা নির্ঘাত ভাবত অভীকের মাথাটা এইভাবেই নোয়ানো যাবে। তাই আগে কোন ফোন করে নি।

অভীকের ফোন পেয়ে কিছু বলার আগেই মল্লিক বলে উঠল, হ্যাঁ ডাইভোর্সের রায় পেয়েছি। দু-দিন অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই রায়টা ' ফেবারে' নিয়ে নিয়েছ। তবে আমি অ্যাপিল করব 'হায়ার কোর্টে'।

অভীক সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'দিন তিনেক হোল বিয়ে করেছি। এবার সুমনের ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

মল্লিকা প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'কি বললে? এরই মধ্যে বিয়ে করে ফেলছ? তার মানে আর একটা মেয়েকেও সর্বনাশের জন্যে নিয়ে এসেছো?'

—'সব কিছু নিজেকে দিয়ে বিচার করলে ঠিক হয় না। তোমার কাছে যেটা সর্বনাশ বলে মনে হচ্ছে। অন্যের কাছে তা নাও হতে পারে।'

—'এ সব শয়তান লোকদের মুখে, কথার মার প্যাঁচ।'

অভীক বলল, 'সুমনের ব্যাপারে কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে—ও যার কাছে থাকা ভাল মনে করবে তার কাছেই থাকতে পারবে। তাই ওকে একবার জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার কখন সময় হবে যদি বল, তবে সেদিন আমি তোমার ওখানে যেতে চাই।'

মল্লিকা রেগে গিয়ে বলল, 'তার মানে? কোর্টের রায় তুমি নিজের ফেবারে নিয়ে সুমনকে এখন ছিনিয়ে নিতে চাও?'

—'না তা নয়, তবে সুমন তো এখন কিছু বুঝতে শিখেছে। ওর কাছে একবার শুনে নেওয়া বোধ হয় ভাল। তবে আমার মতে ও যদি তোমার কাছে থাকতে চায় সেটাই হয়তো ভালো। কারণ সন্তান মায়ের কাছেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সে ক্ষেত্রে ওর সব ব্যয় ভার আমিই বহন করতে চাই। যদি দরকার হয় তবে আমি ওকে প্রতি সপ্তাহে গিয়ে পড়িয়েও আসতে পারি।

মল্লিকা বলল, 'তুমি কি মনে কর অর্থনৈতিক দিক থেকে আমি খুব খারাপ অবস্থায় আছি। যে তোমার সাহায্য ছাড়া আমি ছেলেকে মানুষ করতে পারব না?'

'না, তা বলি নি। তবে সুমন যাতে বুঝতে পারে, তার বাবা তার প্রতি কর্ত্তব্যে কোন অবহেলা করে নি।'

মল্লিকা বলল, 'তুমি তাহলে যন্ত্রের মত ওর প্রতি কর্ত্তব্য করে দেখাতে চাও?'

—'না। কর্ত্তব্য, করে দেখাতে চাই না। তবে আন্তরিকতা, অপত্য স্নেহ কখনও ফলাও করে দেখানো যায় বলে আমার ধারণা নেই।'

—'ঠিক আছে তুমি এসো। তোমার সময় মতন' বলে মল্লিকা ফোনটা ঠক্‌ করে রেখে দিল।

সেদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে অভীক সুলেখাকে বলল, 'একটা বিষয়ে তোমার মতামত একটু নেওয়া দরকার।'

সুলেখা বলল, 'এমন গম্ভীরভাবে বলছ যেন সিরিয়াস কিছু।'

অভীক বলল, সিরিয়াস-ই তো। ডাইভোর্সের মামলায় আমি জিতেছি; কিন্তু সুমনের বিষয়ে রায় হয়েছে ও যেখানে থাকতে চাইবে সেখানে ও থাকতে পারবে। আমার ইচ্ছে সুমনকে মল্লিকার ওখানে রাখি। কিন্তু সব খরচ আর পড়াশোনার দায়দায়িত্ব আমিই বহন করি।'

সুলেখা বলল, 'ছেলের দায়-দায়িত্ব বাবাই তো বহন করবে। এ আবার বলার কি আছে। তা সুমনকে তুমি মল্লিকাদির ওখানে রেখে মানুষ করার কথা বলছ কেন? ও যদি তোমার কাছে আসতে চায় তবে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি ওকে নিজের ছেলে বলেই মনে করব।'

—'সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে সন্তান মায়ের কাছে থাকাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই ঠিক করেছি প্রতি শনিবার ওর ওখানে গিয়ে সুমনের কি লাগে না লাগে দেখব। আর ঐ দিনই যদি সম্ভব হয় ওকে পড়িয়ে আসব।

সুলেখা বলল, ভালই তো, তুমি এর জন্যে আমার অনুমতি প্রার্থনা করছ?

—'না। সেরকম নয়। তবে।'

—'তবের কিছু নেই। ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছ।'

* * * * *

মল্লিকার ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে অভীক ফোন করেই গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে দেখে মল্লিকা নেই। তবে কাজের মাসি সুধাকে অভীকের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছিল, আজ বিকেলে অভীকবাবু নামে এক ভদ্রলোক আসবেন। আমার আর সুমনের খোঁজ করবে। তুমি বলবে দিদিমনি একটা দরকারী কাজে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে দেরী হবে। তবু যদি বসতে চায় তবে বসতে দিও।'

কাজ কিছুই ছিল না। কোন একটা কাজ খুঁজে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। আসলে অভীককে বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে এখনও তাকে 'নেগলেট' করে। সুমনকে অবশ্য বলেছিল, 'সুমন তোমার বাপী আজ বিকেলে আসবে। তুমি বাড়ি থেকো। ঐ সময়ে পাশের ফ্ল্যাটে খেলতে যেও না।"

কথাটা শুনে সুমন কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। বাপী আসবে? তার বেশ মনে পড়ে; মা তাকে নিয়ে এবাড়িতে চলে আসার পর তার একদম ভাল লাগত না। প্রায়ই মাকে জিজ্ঞেস করত, 'মা আমাদের তো বাড়ি আছে। তবে আমরা এখানে এসে থাকছি কেন?'

মল্লিকা কঠিন স্বরে বলেছিল, 'এখন থেকে আমরা এখানেই থাকব।' রাগত স্বরে মার কথাটা শুনে সুমন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তবু ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা বাপী এখানে আসবে না?'

মল্লিকা বলেছিল, 'আসবে কি, না আসবে তার ইচ্ছে। তবে ধরে নাও আসবে না।'

তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গেছে 'বাপী' আসে নি। মাঝে একদিন দু-দিন মনটা খারাপ হওয়াতে সুমন মাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, মা, বাপী—।'

মল্লিকা বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'কি বাপী, বাপী করো না তো। তোমার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

এরপরে সুমন আর কোন কথা বলে নি। বাপী, ঠাকুমার কথা মনে হলে চুপ করেই থাকত।

হঠাৎ মার কাঁছে আজকে 'বাপী আসবে, ঘরে থেকো' শুনে সুমন অবাকই হোল।

ছেলের মনের ভাবটা মল্লিকা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু উপেক্ষা করে কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

অভীক নির্দিষ্ট সময়েই মল্লিকার ফ্ল্যাটে এসে শুনল মল্লিকা বাড়িতে নেই। অভীক ঢুকবে কি ঢুকবে না একটু ইতঃস্তত করতেই সুধা জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কি?" সুমন ভিতরেই ছিল। মাসির কথা শুনে দরজার কাছে এসে দেখে বাপী দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে গিয়ে অভীকের কাছে গিয়ে, 'বাপী তুমি এসেছ! মা বলে গেছে তুমি আজ আসবে।' এই বলে অভীকের হাত ধরে ঘরে এনে বসাল। সুধা ঢুকতে দেবে কি দেবে না ভাববার অবকাশই পেল না।

সুমন দীর্ঘ তিন বছর হতে গেল বাবাকে দেখে না। এ কয় বছরে কত কথা যে তার জমে আছে! এক এক করে সব কথা সে বক্‌বক্ করে বলতে লাগল—তার স্কুলের কথা, বন্ধু-বান্ধবের কথা। পড়ার কথা কত কি! অভীক চুপ করে বসে থেকে সুমনকে বলার সুযোগ করে দিল। বসে থাকতে থাকতে অনেকটা সময় চলে গেল। মল্লিকা তখনও ফেরেনি। সুধা একবার চা নিয়ে এসেছিল। অভীক খায় নি। ইচ্ছে করে নি তার খেতে। সুমন একবার বলেছিল, 'বাপী চা না খাও তবে বিস্কুট দুটো খাও। অভীক হেসে বলেছিল, না বাবা, আজকে কিছুই খেতে ভাল লাগছে না।'

মল্লিকার অনুপস্থিতিটা যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকী থাকে নি। নিজেকে প্রথমে

একবার অপমানিত মনে হোল কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল মল্লিকার সাথে এখন তো আর তার মান অপমানের কোনো পালা নেই। তাছাড়া তার আসল উদ্দেশ্য তো সুমনের সাথেই দেখা করা। মল্লিকা থাকল বা না থাকল তার কিছু আসে যায় না। সুমনের সাথে আরও কিছুক্ষণ কাটানোর পরে বলল, সুমন, আজ চলি আবার আসব।' এই বলে উঠতেই ডোর বেলটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সুমন বলল, 'এই বোধ হয় মা এসেছে। বাপী আর একটু বসে যাও। সুধা দরজা খুলে দিতে মল্লিকা প্রবেশ করল।

অভীকের সাথে যাতে দেখা না হয় তাই মল্লিকা একটু দেরী করেই ফিরেছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখে অভীক। তবে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ানো। কোন রকম ভূমিকা না করেই মল্লিকা গম্ভীরভাবে বলল, 'একটা জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছিল। তাই কথা দিয়েও থাকতে পারি নি।'

অভীক কোন উত্তর দিল না।

মল্লিকা বলল, 'যদি যাওয়ার তাগাদা না থাকে দু'মিনিট বসতে পার। আমি হাত মুখ ধুয়ে কাপড়টা পালটিয়েই আসছি।'

অভীক থাকবে কি থাকবে না একটু ইতস্তত করতেই সুমন চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বাপী বস।'

অভীক না বসে পারল না।

কিছুক্ষণ বাদে মল্লিকা এক কাপ চা হাতে নিয়ে টেবিলের অন্য পাশে এসে বসতে বসতে বলল, 'সুধার কাছে শুনলাম, তোমাকে চা অফার করেছিল। তুমি খেতে চাও নি। তাই এখন আর অফার করছি না।'

অভীক এবারও কোনও উত্তর দিল না।

মল্লিকা চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে বলল, 'এবার বল কি জন্যে এসেছ?'

অভীক কোন রকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল, 'সুমন তোমার কাছে থাক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওর পড়াশোনা সমেত সব কিছুর ব্যয় ভার আমিই বহন করতে চাই।'

মল্লিকা বলল, 'কেন? তুমি কি মনে কর ব্যয়ভার বহন করতে আমি অক্ষম? ডাইভোর্সের মামলায় আমি তো মেন্টেনেন্সের জন্যে কোন ক্লেম করি নি?'

অভীক বলল, 'না, সেটা আমি জানি।'

—'তবে? ছেলের প্রতি কর্ত্তব্যের তাগিদে?—তা ভাল। আমার আপত্তি নেই। তবে সুমনের ভবিষ্যৎ কিন্তু আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিতে চাই না। ওটা থাকবে আমারই 'কন্ট্রোলে'।

অভীক বলল, 'সুমন কার কন্ট্রোলে থাকবে সেটা নিয়ে আমি তর্ক করতে আসি নি। ওর যেটা ভাল হয় বলে মনে করবে সেটাই কোর। এই বলে অভীক উঠে দাঁড়াল।

মল্লিকা বলল, 'উঠে দাঁড়ালে যে? যাওয়ার আগে 'যাচ্ছি' বলতে হয় এটা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি।'

অভীক একবার তাকাল মল্লিকার দিকে কিন্তু কোন কথা না বলেই পা বাড়াল দরজার দিকে।

মল্লিকা বলে উঠল, 'দাঁড়াও। মামলার রায় হাতে আসতে না আসতেই শুনলাম বিয়ে করে ফেলছ। তা হাঁটুর বয়সী ছাত্রীকে বিয়ে করতে বিবেকে দংশন লাগল না?'

অভীক বলল, 'বয়সের পার্থক্য একটু বেশি হলেও কোন নাবালিকাকে তাই বলে বিয়ে করি নি। তাছাড়া খাদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মহিলাকে সরিয়ে এনে যদি ঘরে আশ্রয় দেওয়া যায় তাতে কোন দোষের হয় বলে আমি মনে করি না।'

—'ও তা হলে কোন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে উদ্ধার করেছ?'

—'পিতাকে উদ্ধারের কথা বলি নি।'

—'তবে? কন্যাকে উদ্ধার করেছ? ও সব বাজে কথা। আসলে একজন মহিলার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নিজের লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছ।'

—'কি বলছ তুমি?'

—'ঠিকই বলছি। আমি কোন পুরুষ জাতকে বিশ্বাস করি না। তারা বাইরে ভাল মানুষের মুখোষ পরলেও ভিতরে মেয়ে মানুষের সাথে নিজেদের মনে করে খাদ্য খাদক।'

—ইন্ জেনারেল' এই ধারনা কখনো ঠিক হতে পারে না।

—'একসেপ্‌সন্' সব কিছুরই থাকে। তবে অধিকাংশই এরকম। এই যে তুমি যাকে ধরে এনেছ।

—ধরে এনেছি মানে?

—'এই যাইহোক ঘরে এনেছ; তোমার কথা শুনেই ধারণা হচ্ছে গরীব ঘরের মেয়ে চাক্‌রী বাক্‌রী করে না। শিক্ষিত হতে পারে। কিন্তু দুদিন বাদেই তার শিক্ষার কোন মূল্য থাকবে না। সংসারের জাঁতাকলে সে নিজেকে মনে করবে বন্দিনী।'

—'তবে তুমি বলতে চাও মেয়েরা তাহলে সংসার করবে না?'

—করবে না কেন? নারীর বন্দিনী দশা ঘুচাতে হলে তাকে প্রথমে হতে হবে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। যতক্ষণ না নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার পূর্ণ স্বাধীনতা আসতে পারে না। শুধু নারী কেন? সবার ক্ষেত্রেই তাই। এমন কি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই। দেশ যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে স্ব-নির্ভর না হয় তবে সত্যিকারের স্বাধীনতাও সে ভোগ করতে পারে না।'

—'নারীর স্বাধীনতা মানেই কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হলেই কিন্তু সংসারের শান্তি আসে না।'

—'এ কথা বলে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

—'কিছুই বোঝাতে চাইছি না কাউকে। আজ আমি তোমার সাথে তর্ক করতে আসিনি। কথায় কথা বাড়বে। আমি বরং উঠি' এই বলে অভীক উঠে দাঁড়ালো।

* * * * *

বাড়িতে ফিরতে সেদিন অভীকের রাত হয়ে গেল। সুলেখা চিন্তা করছিল। মল্লিকাদির বাড়ি যাবে। বলেই গিয়েছিল। তবু এতদিন বাদে যাচ্ছে, কোন রাগারাগি হোল না তো?

বিনোদাদেবীও জিজ্ঞেস করলেন, ' বৌমা, অভীর ফিরতে এত রাত হচ্ছে, তোমায় কিছু বলে গেছে?'

সুলেখা বলল, 'হ্যাঁ বলেছিল। কলেজ থেকে আজ একটু আগে বেরিয়ে মল্লিকাদির ফ্ল্যাটে যাবে। তবে সে তো বলেছিল বিকেলের দিকে যাবে। এত রাত হতে পারে এমন কিছু তো বলে যায় নি।'

বিনোদাদেবী বললেন, 'বড় বৌমার ওখানে?' মল্লিকার সাথে অভীকের ডাইভোর্স হয়ে গেছে বিনোদাদেবী জানেন। মল্লিকা এখন আর অভীকের বৌ নয়। তাকে এখন আর বড় বৌমা বলা যায় কি যায় না সে কথা মনেও এলো না। তাই জিজ্ঞেস করল, 'এতদিন বাদে বড় বৌমার ওখানে?'

সুলেখা বলল, 'হাঁ, সুমনের সাথে দেখা করাটাই মূল উদ্দেশ্য। এখন থেকে ওর দেখাশোনা খরচ-খরচা আপনার ছেলেই বহন করতে চায়। তাই সেই বিষয়েই মল্লিকাদির সাথে কথা বলতে যাবে বলেছিল।'

বিনোদাদেবী বললেন, 'ঠিক চিন্তাই করেছে। ছেলেটা তো ওরও। সে-ই বৌমার কাছে গেল অথচ আগে গেলে হয়তো ডাইভোর্সটি হোত না। দু'জনের কি যে ধর্নুভাঙা পণ, মেয়ে মানুষের অত জেদ ভাল নয়। বাড়িতে তো দুজন লোক। কি যে আমাদের দোষ বুঝলাম না। নিজের খুশী মতনই তো যখন তখন কাজ করেছে। কোন তাতেই তো বাধা ছিল না। তবু এ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যেই নাকি চলে গেল।

সুলেখা বলল, 'যা হয়ে গেছে তা আর নতুন করে তুলে লাভ নেই মা। আসুন আমরা এখন নতুন করে শুরু করি।'

বিনোদাদেবী বললেন, 'তাই শুরু কর মা আমার নিজের ছেলে বলে বলছি না— অভী সত্যিই খুব ভাল ছেলে। ওর বাইরেটা কঠিন হতে পারে। কিন্তু ভিতরটা এখনও

শিশুর মত সরল। ওর হৃদয়টা সত্যি যেন মাতৃহৃদয় ছোট বেলা থেকে ওর উপর দিয়ে একটার পর একটা ঝড় গেছে। একটা দিনের জন্যেও শান্তি পেল না।

কথা বলতে বলতে বিনোদাদেবীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সুলেখা উঠে গিয়ে বিনোদাদেবীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বলল, 'মা।'

ডোর বেলটা হঠাৎ বেজে উঠল। অভীক বোধহয় এসেছে। সুলেখা ও বিনোদাদেবী দুজনেই উঠে দাঁড়াল। সুলেখা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে অভীক ভিতরে ঢুকল।

বাইরে থেকে কেউ পরিশ্রম করে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা সুলেখার স্বভাব বিরুদ্ধ। সুলেখা প্রশ্ন না করলেও অভীক মা আর বৌ এর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল। তাই নিজেই বলল, 'মল্লিকা বাড়ি ছিল না। কি কাজে যেন তাকে বেরুতে হয়েছিল। ফিরল রাত করে তারপরে কথাবার্তা বলে বেরুতেই দেরী হয়ে গেল।'

* * * * *

প্রতিদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অভীক কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে। তারপর শুতে যায়। সে রাতেও অভীক বই খুলে বসল। কিন্তু মন বসাতে পারল না। বইটা টেবিলের উপরে খোলা ছিল, কিন্তু তাতে দৃষ্টি ছিল না। সুলেখা বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে অভীকের পিছনে এসে দাঁড়ালো। আস্তে করে অভীকের কাঁধের উপর হাত দিয়ে বলল, 'তুমি আজ যাবে মল্লিকাদিকে ফোন করনি আগে?'

অভীক চমকে উঠে বলল, 'ও, তুমি। শোওনি এখনো?'

সুলেখা আবার বলল কথাটা, 'মল্লিকাদিকে আগে ফোন করে যাও নি।'

—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় কাজের অছিলায় এই অনুপস্থিতিটা ইচ্ছাকৃত।'

—'তাতে তোমার মন খারাপ করার কি আছে? আসল উদ্দেশ্য তো তোমার ছিল সুমনের সাথে দেখা করা। সে তো তোমাকে অপমান করে নি।'

অভীক সুলেখার হাতটা টেনে নিজের বুকের কাছে এনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না, তা অবশ্য করে নি।'

—'তবে কিন্তু তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই।'

—'না, মন খারাপ করছি না।—এই আর কি—। চল্ শুয়ে পড়ি। অনেক রাত হয়েছে।'

সুলেখা টিউব লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে নাইট বাল্বটা জ্বেলে দিল।

* * * * *

দেখতে দেখতে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল সুলেখা এ বাড়িতে এসেছে। বিয়ের দিন

সেই যে এক কাপড়ে বাপের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল—এ ছয় মাসে একটা দিনও যাওয়া হয়নি। বিয়ের দিন বাপের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানই হয় নি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে সুলেখার বাবা-মা আর অভীকের এক বন্ধু এসেছিল। পরে সুলেখার ইচ্ছা অনুসারে অভীক সুলেখাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়েছিল। মা কালীর পুজো দিয়ে দুহাতে দু'টো শাখা পরিয়ে দিয়েছিল। আর প্রসাদের মধ্যে শাল পাতায় যে সিঁদুর গোলা ছিল তাই-ই সিঁথিতে ছুঁইয়ে দিয়েছিল। অভীক বাড়িতে ছোটখাট একটা অনুষ্ঠান করেছিল। খুবই সামান্য সেটা। পাঁচ-ছয় জন বন্ধুকে রাতে নিমন্ত্রণ করেছিল। কোন ঠাকুর রেখে রান্না নয়। রোজকার রান্নার মাসি বিমলাই রেঁধেছিল। কোন উপহার আনা বারণ। বন্ধুরা তাই কিছু রজনী গন্ধার 'স্টিক' নিয়ে এসেছিল। সেই রজনীগন্ধার স্টিক-ই তারা কিছু দিয়েছিল অভীকের হাতে আর কিছু দিয়েছিল সুলেখার হাতে। ষ্টিকগুলো অভীক আর সুলেখা পরস্পরের হাতে বদল করে বলেছিল, 'এই আমাদের মালা বদল হয়ে গেল।'

সুলেখার মা তারা দেবী আর ভাই-বোনেরা চেয়েছিল বিয়েটা ক্ষুদ্র হলেও কিছু অনুষ্ঠান করে বাড়িতেই হোক। কিন্তু দেবেশবাবু কিছুতেই রাজি হন নি।

মালিকের ছেলেটা কি করে যেন জানতে পেরেছিল যে এ বিয়েতে সুলেখা রাজি নয়। তলে তলে সে অন্যত্র বিয়ে করে চলে যেতে চায়। একথা জানার পর থেকেই সে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে এই বিয়ে সে পণ্ড করে দেবে। আশঙ্কাটা অমূলক নয়। কিন্তু দেবেশবাবুর মূল কারণ ছিল আশা ভঙ্গের। মালিকের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেন সামান্য টিকিট বেচার চাকরী থেকে অন্য চাকরী পাবেন। আর কিছু নগদ প্রাপ্তিও আশা করেছিলেন। কিন্তু সুলেখাকে কোনভাবেই রাজি করানো গেল না, উপরন্তু বাপ-মেয়ের কথা-কাটা কাটির সময় মেয়ে একসময় বলে বসল, আমার বিয়েতে তোমার এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। অভীক স্যার আমাকে এক কাপড়েই নিয়ে যেতে চাইছে। দেবেশবাবু সেই কথাটার উপরেই জোর দিয়ে রইলেন। কথাটা রাগের মাথায় বলে ফেললেও সুলেখা ভাবতে পারে নি যে একেবারে কোন অনুষ্ঠান না করে বাবা তাকে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন তাকে কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে যেতে হোল তখন বাপের উপর প্রচণ্ড একটা অভিমান নিয়ে চলে গেল। সেই অভিমানেই সুলেখা এই ছয়মাসের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও বাপের বাড়িতে যায় নি। অভীক অবশ্য কয়েকবারই বলেছে, তোমার এই অভিমান করে থাকাটা ঠিক নয়, মা-ভাই-বোন তো বিয়েতে আপত্তি করে নি। বাবাও যে এ বিয়েতে আপত্তি করেছে তাও নয়। তবে তার মালিকের ছেলের সাথে বিয়ে হলে আর্থিক দিক থেকে কিছুটা হয়তো স্বচ্ছলতা আসত সংসারে। তা এক কাজ কর, তুমি বাপের বাড়ি গিয়ে বল, এখন থেকে তোমার ভাই আর বোনের পড়াশোনার পুরো খরচটা

তুমিই বহন করবে। সেটাও তো একদিক থেকে সংসারে সাহায্য করা হবে। বলে বলে অভীক সুলেখাকে পাঠিয়ে ছিল বাপের বাড়িতে। সেই থেকে ভাই বোনের পড়াশোনার খরচের সাথে অন্যান্য খরচও কিছু কিছু অভীক জোগান দিত। আসলে অভীক নিজেও যেমন পড়াশোনা ভালবাসে কেউ পড়াশোনা করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছে, শুনতে পেলে তাকেও যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করে।

বিয়ের পরে সুলেখা যাতে এম. এ. পড়াটা কমপ্লিট করতে পারে তার দিকেও অভীকের লক্ষ্য কম ছিল না। প্রথম দুটো দিন সুলখা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ করতে যায় নি। ভেবেছিল পরের দিন থেকেই বৌ-মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে? তাই দুটো দিন একটু ঘরে থেকে শাশুড়ীর কাছে বসে গল্প করে, কথা বলে পরিচিত হতে চেয়েছিল। অভীক লক্ষ্য করে বলেছিল, 'কি গো তুমি ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে না?'

সুলেখা উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ যাব। দুদিন একটু সংসারটা দেখে নিই।'

—'হ্যাঁ। তা দেখে নাও। তবে পড়াশোনটা ঠিক মতন কোর। এম. এ. পার্ট ওয়ানে অল্প নম্বরের জন্যে ফার্স্টক্লাশ পাও নি; সেটা মনে আছে তো? পার্ট-টুতে ওটা কভার করে ফার্স্ট ক্লাশ পেতে হবে।'

—সুলেখা হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা, তুমি এখনো আমাকে পড়া নিয়ে সে রকম বকবে?'

—সে রকম কি গো? আরও বেশি বকব। এখন যদি খারাপ রেজাল্ট হয় তবে সকলে দুষবে আমাকে। সংসারের যাঁতাকলে ফেলে একটা ভাল মেয়ের কেরিয়ারটাকে নষ্ট করে দিল।'

—'কে তোমাকে দুষতে আসছে?'

—'তার মানে পড়াশুনোর কি ঢিলেমি দেবে তাই বলে।'

—'না বাবা না'।

* * * * *

অভীক ঠিক করেছে প্রতি শনিবার করে সুমনের কাছে যাবে। কলেজের অফ্‌ডে-টা ওর শনিবার যাতে হয় সেইভাবে বলবে। তা হলে পার্টির কাজকর্ম যা কিছু দুপুরের মধ্যে করে বিকেলের আগেই ওখানে চলে যাবে। সুমনের পড়াশোনা দেখিয়ে দেবে বা অন্য যা কিছু লাগবে দিয়ে আসবে। যদি অন্য মাষ্টার মশাই এর দরকার হয় তবে রেখে দেবে। সেটা অবশ্য মল্লিকার কাছে শুনেই রাখবে। কারণ যদি রাখতে হয় তবে পড়াতে তো আসবে মল্লিকার বাড়িতে, সে ক্ষেত্রে ওকে শুনে রাখাই ঠিক। দ্বিতীয় দিনও

যাওয়ার আগে অভীক মল্লিকাকে ফোন করেছিল। ফোন ধরে মল্লিকা বলেছিল, ' সেদিনই তো কথা হয়ে গেছে। নতুন করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।' বলেই ফোনটা রেখে দিয়েছিল। অভীকের খারাপ লাগলেও গায়ে মাখে নি।

সুমনের কাছে যাবে বলে সুলেখা সেদিন কিছু মালপো করেছিলো। নিজেদের জন্যে কিছু রেখে কয়েকটা মালপো টিফিন কৌটোয় ভরে বলেছিল, "যাচ্ছ যখন সুমনের জন্যে নিয়ে যাও।'

অভীক সেদিনও গিয়ে দেখে মল্লিকা বাড়ি নেই। না থাকুক, সুমন আছে, কাজের মাসি সুধা দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

বাবাকে পেয়ে সুমনের বেশ ভালই লাগল। পড়া বুঝে নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা কত কথা বলছিল। কয়েক ঘন্টা কোথা দিয়ে চলে গেল ওরা বুঝতেও পারল না। উঠে যাওয়ার মুখে মল্লিকা ঢুকল। অভীক কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাই দেখে মল্লিকার মেজাজটা গরম হয়ে গেল। বলল, 'কি ব্যাপার? আমি ঢুকছি, আর তুমি চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে?'

অভীক কথাটা পুনরায় উচ্চারণ করে বলল, 'চোরের মত?' আমি যে আজ আসব সে তো ফোনেই বলেছিলাম। আর ফোনটা তো তুমিই ধরেছিলে।'

মল্লিকা বলল, হ্যাঁ, আমিই ধরেছিলাম। কিন্তু এমন নিঃশব্দে চলে যেতে চাইছ যে—।' কথাটা শেষ করার আগেই সুমন মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা বাবা, আজ আমার জন্যে মালপো এনেছিল। কি সুন্দর খেতে।'

মল্লিকা শুনে বললো, 'মালপো? অভীকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাল-ভাত রান্নার সাথে তুমি কি এখন মিষ্টি তৈরী করাও শিখে গেছ নাকি?'

অভীক একবার মনে করল কোন উত্তর দেবে না। কিন্তু কি ভেবে বলল, 'মালপো সুলেখা তৈরী করেছে। এখানে আসব শুনে সুমনের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

—'সে কী সতীনের ছেলের জন্যে মিষ্টি করে পাঠাচ্ছে।'—ওর মধ্যে বিষ নেই তো?'

—'ডাইভোর্সের পরে নিশ্চয়ই জানা আছে, তোমাকে এখন স্ত্রী বলা যায় না। তাই সুলেখা কারও সতীন নয়। আর বিষ দিলে সুমন নিশ্চয়ই এখনও সুস্থ থাকত না।'

—'বিষের কথাটা বললাম কথার কথা। তা বিষ না দিলেও খাবারের মধ্যে শিকড়-বাকড় মিশিয়ে ক্ষতি করার জন্যে তুকতাক অনেকেই করে থাকে। সেরকম কিছু করছে না তো?"

অভীক বলল, ' সে কি? তুমি এখন এ সব বিশ্বাস করছ নাকি? এক সময় যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মঞ্চের নেত্রী ছিলে না? সেটা কি ছেড়ে দিয়েছ?'

—' ছেড়ে দেব কেন? তার কাজ যেমন করার করে যাচ্ছি। মানুষ তো সর্বক্ষেত্রে

এক রকম থাকে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা বিভিন্ন হতে বাধ্য।'

—'ঠিকই। সংসারে থাকতে হলে ' ফ্লেক্সিবিলিটি' বজায় রাখা আর 'কম্প্রোমাইজ' না করে থাকা যায়না। কিন্তু তোমার স্বামীগৃহ ত্যাগ তো এর বিরুদ্ধেই জেহাদ করে। আর এখন সেই কথাই তুমি বলছ?'

—'আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। তুমি যাচ্ছ যাও।'

* * * * *

এম. এ. পার্ট-টুর ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। আর মাসখানেক দেরী আছে। পড়াশোনার বিষয়ে সুলেখা বরাবরই সিরিয়াস। তারপর অভীক সবসময়ই ওর পড়ার বিষয়ে নজর রেখে চলেছে। মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সংসার করতে ভাল লাগছে তা কর। কিন্তু সংসার করতে গিয়ে নিজের কেরিয়ারটাকে নষ্ট কোর না।' আসলে সুলেখা বেশ খাটিয়ে মেয়ে। বিয়ের আগে পাঁচ জনের সংসারে মার হাতে কত কাজ করে দিয়েছে। আবার বাইরেও গুটি কয়েক টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ বহন করেছে। তাই বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে সুলেখার কোন অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া এখানে রান্নার লোক আছে, লোক সংখ্যাও কম। যেটুকু কাজ করার সুলেখা আগ্রহের সাথে করে শাশুড়ী আর অভীকের মন কেড়ে নিয়েছে। তাই অভীক বার বার মনে করিয়ে দেয়ে পড়াশোনার যেন অবহেলা না হয়।

সুলেখার এমনিতেই অভ্যেস সারাদিন কাজ করে রাত করে পড়া। অভীকের অভ্যেস প্রতিদিন রাতে খাওয়ার পরে বই নিয়ে বসা। এক একদিন দুজনের পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে যায়। ঘুমের ব্যাঘাতেই হোক বা কোন অনিয়মেই হোক একদিন সুলেখা শরীর খারাপ বোধ করতে লাগল। বমি-বমি ভাব। দুর্বলতা, সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথা ঘোরে, অ-খিদে ইত্যাদি। অভীক ডাক্তারকে বলে ওষুধ এনে দিল। কমেছিল। কিন্তু তিন-চার দিন বাদে আবার শুরু হোল। এরকম দু-তিন বার হতে সুলেখার কিরকম সন্দেহ হোল। তার প্রতিমাসের শরীর খারাপটাও তো দু মাস হোল হয়নি। তবে কি সে মা হতে যাচ্ছে? একদিন রাতে শোয়ার পরে অভীকে বলল 'আমার মনে হচ্ছে এই বমি বমি ভাবটা এখন যাওয়ার নয়।'

অভীক জিজ্ঞেস করল, 'কেন'?

—'কেন আবার কি? মনে হচ্ছে তুই আবার বাবা হতে চলেছ।'

—'তাই? খুব ভাল কথা। নারীত্বের সার্থকতা তো মাতৃত্বে।'

—'সে তো হোল। কিন্তু পরীক্ষার মুখে অসুস্থ হয়ে পড়লে?'

—'ধুস, পরীক্ষা তো আর মাসখানেক বাকী। এর জন্যে কখনও পরীক্ষা আটকে থাকে? খবরটা শুনলে মা খুবই আনন্দ পাবে।'

—'দাঁড়াও। আগেই খবরটা দিও না। ডাক্তারী পরীক্ষায় আগে কনফার্ম হয়ে নাও।'

কয়েকদিন বাদে ইউরিন পরীক্ষায় 'কনফার্ম'ই হয়েছিল যে সুলেখা অন্তঃস্বত্ত্বা; খবরটা বাড়িতে একটা আনন্দের জোয়ার এনে দিল। সুমনকে নিয়ে মল্লিকা চলে যাওয়ায় বিনোদাদেবী বেশ ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এক সময়ের কর্মঠ পেটা শরীরে যেন একটার পর একটা রোগ এসে বাসা বাঁধল। এখন নিজের জন্যে কোন চিন্তা নয় যত চিন্তা অভীককে ঘিরে।—ছেলেটা চিরকালই, পরোপকারী, আত্মভোলা, বাউন্ডুলে। যদিও বা সংসারী হোল তাও টিকল না। পরবর্ত্তীকালে সুলেখা যখন বৌ হয়ে ঘরে এলো স্বভাবতই বিনোদাদেবী একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বিয়ে হয়ে এসেই কিছুদিনের মধ্যে সুলেখা বেশ সবাইকে আপন করে নিয়েছিল। তার বাচ্চা হবে। মানে ঘরে আবার একটা শিশু টলমল পায়ে হেঁটে বেড়াবে, আধো আধো কথা বলবে, দুষ্টুমি করবে,—এসব ভেবেই বিনোদাদেবীর মনটা আনন্দে ভরে উঠল। কথাটা শোনার পরদিন থেকেই সুলেখার সমস্ত কাজের ভার নিজের হাতে নিয়ে বললেন, ' বৌমা এখন থেকে তুমি আর এত বেশি কাজ করবে না। আমরাই করে দেব।'

সুলেখা বলে, 'বেশি কাজ আর কোথায় মা। রান্নার মাসি বিমলা আছে। একটা ঠিকে ঝি বাসন মেজে দিয়ে যায়। তাছাড়া ডাক্তার বলেছে,—হাল্কা কাজের মধ্যেই থাকতে।'

—'তা বলুক। এমনিতেই পরীক্ষা এসে গেছে। পড়াশোনার একটা চাপ আছে। আমার ছেলে তো পড়াশোনা বলতে পাগল। প্রায়ই তোমাকে বলতে শুনি—রেজাল্ট ভাল করতেই হবে।'

—'তাই বলে বসে বসে খাব? বাপের বাড়িতেও তো এমন সুখ কোনদিনও পাই নি।'

—'বাপের বাড়িতে পাও নি বলে শ্বশুর বাড়িতে পাবে না এমন কি কথা আছে? মেয়েদের বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িটাই আসল। এখানে ভাল থাকলেই ভাল।'

* * * * *

পরীক্ষাটা সুলেখার ভালই হয়েছিল। আশা করছে পার্ট-ওয়ানে যে ক'টা নম্বর কম ছিল সেটা কভার করে সর্বসাকুল্যে 'ফার্স্ট ক্লাশটা পেয়ে যাবে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর রেজাল্ট বের হতে মাস তিনেক তো লেগেই যায়। কোন কোন সময় এর বেশিও লাগে। অভীক চায় না যে এ কয় মাস সুলেখা অলসভাবে সময় নষ্ট করে দিক। তাই

একদিন বলল, 'পরীক্ষার জন্যে কিছুদিন খাটাখাটানি গেছে ঠিকই। তাই বলে এই সময়টা নষ্ট কর না। একটা মাস কোন পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে না। তারপর বরং কি বিষয়ে রিসার্চ করা যায় তার জন্যে পড়াশোনা শুরু করতে পার।'

কথাটা শুনে সুলেখা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আচ্ছা, আমার উপরে তোমার মাষ্টারী করাটা এখনো দেখছি গেল না।'

—অভীক বলে, 'ওই তো, ভালর জন্যে বলছি কিনা তাই গায়ে লাগছে না।'

সুলেখা বলল, 'আহা, রাগছ কেন? আমার ভাল তুমি দেখবে না তো দেখবে কে?'

আসলে সুলেখা বলে নেয়, ছাত্র-ছাত্রী বা পরিচিত মহলে যাদেরই একটু সম্ভাবনা আছে বলে লক্ষ করেছে, অভীক তাদেরই কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে মহিলাদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে, তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে দেওয়ার যদি সুযোগ পায় তবে, চেষ্টার ত্রুটি করে না। অভীকও বিশ্বাস করে সমাজে নারীদের এত যে দুরবস্থা, এত যে নিপীড়ন এর বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর নয়। সুলেখার হয়তো ভরণ পোষণের জন্যে টাকা রোজগারের দরকার নেই। কিন্তু অভীক চায় সুলেখা স্লেট বা নেট বা স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকতা লাইনে চাকরী করুক। যাতে সে কোন সময়ের জন্যে নিজেকে মনে না করে সংসারে জাঁতাকলে পড়ে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল বা নিজেকে পরমুখাপেক্ষি মনে করে। তবে এই অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা নারীর দুঃখ কষ্টের অন্যতম কারণ হলেও অভীক মনে করে না যে এটাই প্রধান কারণ। মল্লিকার সাথে অভীকের বিরোধ এখানেই। মল্লিকা মনে করে এখন যে রকম পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ইচ্ছানুসারে নারীর ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, যেদিন নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে সাবলম্বী হয়ে নিজের ইচ্ছা বলে পুরুষের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে সেই দিনই আসবে প্রকৃত নারী মুক্তি,—তা না হলে নয়। এর জন্যেই চাই নারীর অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরতা। অভীক বার বার বলেছে, ' তোমার এই সিদ্ধান্ত পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ মনভাব থেকেই এসেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হলেও নারী মুক্তি আসবে না। যথার্থ নারী মুক্ত আসবে সেই দিন যেদিন নারী প্রকৃতঅর্থে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। যে শিক্ষায় তার প্রসার ঘটবে মনের। প্রসার ঘটবে তার চিন্তা ধারায়। তার জন্যে তাকে ডিগ্রীধারী হতেই হবে তার কোন মানে নেই। কেন না অভীকের দৃঢ় বিশ্বাস নারী নির্যাতনের জন্যে পুরুষ দায়ী হলেও প্রকৃত দায়ী নারী।

* * * * *

কিছুদিন যাতায়াত করার পরে মল্লিকার বাড়িটা অভীকের কাছে সহজ হয়ে এসেছে।

শনিবার এলেই সুমন আশা করে থাকে বাবা আসবে। মাষ্টার মশায় থাকলেও বাবার কাছে পড়তে তার বেশ ভাল লাগে। মল্লিকাও প্রথম প্রথম কিছুদিন বাড়িতে না থেকে এড়িয়ে গেলেও, আজকাল বাড়িতে থাকে। কিন্তু অভীককে দেখলেই তার মধ্যে কেমন যেন একটা পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জেগে ওঠে। তাই কথাবার্ত্তা বিশেষ হয় না। যেদিন বা হয় সেদিনই শুরু হয়ে যায় নীতিগতভাবে পরস্পরের তর্কাতর্কি। কেউ-ই তার অবস্থান থেকে সরে আসতে চায় না।

একদিন মল্লিকা অভীককে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যে দু-তিন দিন আগে বললে নারী নির্যাতনের জন্যে প্রকৃত দায়ী নারী। তা এই যে প্রতিদিন কাগজে দেখা যায় নারী নির্যাতন, বধুহত্যা, নারীধর্ষণ—এসব কিছুর জন্যেই তাহলে নারীই দায়ী।'

অভীক মুখে একটা ব্যাঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'না, তা কখনও আমি বলি নি। বিশেষ করে নারী ধর্ষনের জন্যে কোন না কোন পুরুষ অবশ্যই দায়ী। কিন্তু আমি বলতে চেয়েছি যে এই সব নারী নির্যাতনের জন্যে তুমি যে ভাবে কেবলমাত্র পুরুষ সমাজকে দায়ী করছ;আমার তাতেই আপত্তি। নারী নির্যাতনের জন্যে নারীর ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। তুমি একটা একটা করে উদাহরণ দেখে মিলিয়ে নিও। এই যে সমাজে একটা প্রথা আছে বধূবরণ। ছেলের বিয়ে দিয়ে নববধূকে শাশুড়ী বরণ করে নেয়। কত সুন্দর প্রথাটা। পরিচিত এক গন্ডি থেকে অচেনা এক পরিবেশে আসছে মেয়েটা। মনে তার কত না ভয়, কত না শঙ্কা। তাকে তুমি অভয় দিয়ে বরণ করে নেবে। তাকে তোমার সংসারের উপযুক্ত করে, তারই হাতে সংসারের ভার দিয়ে তুমি ধীরে ধীরে সরে যাবে বাণপ্রস্থে। কথার কথা;বাণপ্রস্থ এখন নেই জানি। কিন্তু এখন থেকে সংসারের প্রতিদিনের খুঁটি-নাটিতে আর নাকি গলাবে না। মনকে তুমি রাখবে মুক্ত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমার তো মনে হয় প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই শাশুড়ী সে সময় মনে করে, এই মেয়েটি এসেছে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে। আমার সন্তানকে আমার থেকে করে দেবে আলাদা। আমারই সংসারে সেই-ই হয়ে উঠবে কর্ত্রী। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মনোভাব। ফলে শাশুড়ী আর পুত্র বধূর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শাশুড়ী নিজে, বৌ হিসাবে নির্যাতিত হয়ে এলেও, নিজের ছেলের বৌ-এর ক্ষেত্রে যে নির্যাতন করব না, এই মানসিক উদারতা তিনি দেখাতে পারেন না। আর এ ক্ষেত্রে ইউনির্ভাসিটির ডিগ্রীধারী শাশুড়ীরও যে মানসিকতা—প্রাইমারী বিদ্যা শেষ হয় নি এমন শাশুড়ীরও মানসিকতা— সেই অবস্থা। এখনও শাশুড়ীর সামনে ছেলে যদি স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকে তবে শাশুড়ী কুন্ঠা বোধ করে। কিন্তু জামাই যদি মেয়েকে নাম ধরে ডাকে তবে, তৃপ্তি বোধ করেন। জামাই মেয়ের মিল তার কাছে যতটা সুখের, ছেলে-ছেলের-বৌ এর মিল তার কাছে ততটা আশঙ্কার।'

একটু থেমে নিয়ে অভীক আবার বলা শুরু করল, 'বধু হত্যার পিছনে ননদের ভূমিকাও কম নয়। অনেক ননদ আছে তার নিজের সংসারে কেউ এসে নাক গলাক তা চায় না। কিন্তু সে মার কাছে এসে ভাই-এর সংসারে নাক গলাবে। বিয়ের বয়সী অবিবাহিত কোন ননদ যদি থাকে তাহলে তো কথাই নেই। অধিকাংশ সময়েই ভাল হয় না। সব সময়েই তার মনের মধ্যে খেলতে থাকে আমারই বয়সি একজন সংসারে এসে স্বামীসুখ ভোগ করছে; আর আমি পড়ে আছি অবহেলিত। কথায় কথায় তার রাগ। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তার অশান্তি। বিবাহিত যুবকটির হয় প্রাণান্তকর অবস্থা। হয়তো অনেক সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছে। তারপরেও তাকে পড়তে হয় দোটানায়। না পারে মার মন জোগাতে, না পারে স্ত্রীর মনে আনন্দ দিতে। ফলে সে হয় বলির পাঁঠা।'

অনেকক্ষণ-কথাবলার পরে অভীক একটু থামলে, মল্লিকা বলল, 'তুমি যে পুরুষের হয়ে এত সাফাই গাইতে চাইছ এদিকে তো মানবাধিকার কমিশনে পুরুষের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে।'

অভীক বলল, 'হ্যাঁ ঠিকই বাড়ছে। সেটা ভাল লক্ষণ। মহিলারা সচেতন হচ্ছে। আগে তারা নির্যাতিত হয়েও মুখ বুজে সহ্য করত। এখন প্রতিকারের জন্যে এগিয়ে আসছে। ফলে কিছু সুফল তো ফলছেই কিন্তু সংসারে পুরুষেরাও কি ক্ষেত্র বিশেষ কম নির্যাতিত বলে মনে করছ? মাঝে মাঝে চাকরী না করা স্ত্রীর কাছেও তারা নির্যাতিত হয়ে থাকে। লজ্জায় কোন কমিশনের কাছে তারা যেতে পারে না। তাই তাদের কথা জানা যায় না।'

মল্লিকা ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলল, তার মানে নির্যাতিত পুরুষ। তর্কের খাতিরে তোমার কথা যদি মেনেও নিই তবে সেটা হাতে গোনা সংখ্যার ভিতরে। আর নারী নির্যাতন, গণনার অতীত। শুধু নির্যাতিন কেন, নারীকে এখনও ব্যবহার করা হয় পণ্য হিসাবে। উচ্চাকাঙ্খী স্বামী স্ত্রীকে এগিয়ে দেয় 'বসের' কাছে। ব্যবসায় বড় কনট্রাক্ট পাওয়ায় আশায় হোটেলে, পার্টিতে, মালিকের কাছে উপঢৌকন হিসাবে পাঠানো হয় নারীকে। খবরের কাগজে এখনও সংবাদ বের হয় গণধর্ষণের পরে যুবতী নারী পড়ে আছে পুকুরের পাড়ে বা জঞ্জালের ধারে, এঁটো পাতার মত। আমার তো মনে হয় নারী আর পুরুষের সম্পর্কটা খাদ্য খাদকের। তাই পুরুষের কাছে নারী মুক্তির প্রত্যাশা কখনো উচিত নয়।'

অভীক বলল, 'তাই যদি হয়, তবে নারী মুক্তির জন্যে নারীদেরই তো এগিয়ে আসা উচিত। পৃথিবীতে কবে কোথায় পরাধীন জাতিকে শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছে। পরাধীন জাতিকেই রক্ত ঝরাতে হয়েছে স্বাধীনতা লাভের জন্যে। আর নারী মুক্তি বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? নারী নিজের চিন্তাধারায় নিজে চলবে? সামাজিক বাধা-বন্ধন

বলে আর কিছু থাকবে না; তাই হয় নাকি? এতে ছন্ন ছাড়া জীবন যাপন হয়তো করা যায়। শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব। এই সামাজিক বন্ধনের মাঝেই পেতে হবে মুক্তির স্বাদ। এর জন্যে চাই প্রকৃত শিক্ষা। যা মনকে করবে উদার, বাড়াবে সহনশীলতা, আসবে মমত্ববোধ। এরজন্যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা থাকতেই হবে তার কোন মানে নেই। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা যদি মূল বিষয় হোত তবে হাই সোসাইটিতে শান্তি বিরাজ করত সব সময়। কিন্তু ওখানেই তো অশান্তি অনেক বেশি।'

তর্ক করতে করতে এক সময় রাত হয়ে যায়। অভীক উঠে পড়ে। মল্লিকা সূক্ষ্ম খোঁচা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, বাড়ি যাও। নতুন বৌ তা না হলে রাগ করবে।

* * * * *

সুমনের কাছে যেদিন যায় সেদিন অভীক রাত করেই ফেরে এর জন্যে সুলেখা কোনদিনই রাগ করে নি। তবে আজকাল ' প্রেগনেন্সির' শেষ মাসটায় একটু ভয় ভয় করে। ঘরে শাশুড়ী আছে। কিন্তু তিনি বৃদ্ধা মানুষ। যদি অভীক কাছে থাকে তবে একটু যেন সাহস পায়। এর মাঝে একদিন এম এ পরীক্ষায় রেজাল্ট বেরিয়েছে। ফার্ষ্ট-ক্লাশই পেয়েছে। রেজাল্ট বেরুনোর কয়েকদিন বাদে অভীক একদিন সুলেখাকে নিয়ে গাইড-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। রিসার্চ করার জন্যে কথাবার্ত্তাও বলে এসেছে। চাক্‌রী-বাক্‌রীর জন্যে পরীক্ষাও দেবে। তবে ডেলিভারীরর মুখে এখন আর অভীক কোন চাপ দেয় না। হাল্কা মেজাজে, খাওয়া-দাওয়া ঠিক রেখে, শরীরটা যাতে সুস্থ থাকে সেই চেষ্টাই করতে বলে, নবাগতের আগমন প্রত্যাশায় দুজনেই যেন তৈরী হতে থাকে।

এবারও অভীকের ছেলে হয়েছে। বিনোদাদেবীর আনন্দ যেন আর ধরে না। সুমনকে নিয়ে মল্লিকা চলে যাওয়ার পরে যে আঘাত পেয়েছিলেন তা তিল তিল করে কুঁরে কুঁরে শেষ করছিল। অভীকের কাছে মাঝে মাঝে তিনি ঐ বিষয়ে বক বক করলে সে ধমক দিয়ে উঠত, তোমাকে তো বলেছি ঐ বিষয় তুমি ভুলে যাও।' অভীকের পক্ষে যা যুক্তি তর্কে মেনে নেওয়া সম্ভব, বিনোদাদেবীর কাছে তা কখনোই সম্ভব নয়। তাই এতদিন বাদে আবার এক নাতিকে পেয়ে তাকে দু হাত দিয়ে বরণ করে নিলেন। নবাগত বুবাই-এর সব ভার তিনি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারীর পরে সুলেখার যাতে শরীরটা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায় তার দিকেও নজর রাখতেন। তার খাওয়া-দাওয়া যাতে ঠিক মত হয়। ভারী কাজ যাতে কিছু না করে, সব দিকে দেখতেন। সুলেখাই বরং মাঝে মাঝে বলত, 'তোমার শরীরও তো ভাল না, বৃদ্ধ বয়সে এত পরিশ্রম সইবে কেন? আমি বরং তোমার ছেলেকে বলি একটা লোক রাখতে যে বাচ্চার গু-মুঁতের

কাঁথাগুলো অন্ততঃ ধুয়ে দেবে আর মাঝে মাঝে বাচ্চাকে রাখবে।'

বিনোদাদেবী আপত্তি করে বলেন, 'কত ছেলে মেয়েকে আমি মানুষ করে দিলাম। কোন লোক রাখলাম না, এখন নিজের নাতির কাজ করাব লোক দিয়ে, তাই হয় নাকি? আমার শরীরের এখন আর ভাল মন্দের কি দরকার? এখন তোমাদের রেখে থুয়ে ঠাকুরের চরণে যদি আশ্রয় পাই তার থেকে আর বেশি কি চাইব?'

'সিজারে'র পরে সুলেখার কমপ্লিকেশন কিছু হয় নি। বাড়ির সেবা যত্নে তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠেছিল। পি. এইচ. ডি-র কাজটা এখন পুরোদমেই শুরু করেছে। এর মধ্যে একবার 'স্লেট', একবার 'নেট' পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু নাম ওঠেনি। অভীক উৎসাহ দিয়ে বলেছে, 'একবারে 'নেট-স্লেটে' সিলেক্ট হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। পরের বারের জন্যে চেষ্টা কর।' ইতিমধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে প্যানেলে নাম উঠেছে। স্কুলের চাকরীটা বোধ হয় হয়ে যাবে।

* * * * *

বিনোদাদেবীর শরীরটা কিছুদিন ধরে বেশ খারাপ হয়ে গেছে। এক সময়ের কর্মঠ-সুঠাম শরীরটা অসুখ বা ওষুধ কি জিনিস্ জানত না, এখন প্রতিদিন ওষুধ না হলে চলে না। সুলেখা সময় মেপে ঠিক মতন ওষুধ খাওয়ায়। তবু শীতকাল আসলেই বুকে সর্দি জমে শ্বাস কষ্ট এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে মাঝে মাঝে দু-তিন দিন নার্সিং হোমে পর্য্যন্ত রাখতে হয়। এবছরও শ্বাসকষ্ট একটু শুরু হতেই ওষুধ চলছিল। অভীক আর সুলেখা বার বার বলছিল, 'মা তোমার কষ্টটা কি বেশি হচ্ছে? তুমি বল আমি অক্সিজেন বা নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করি।'

বিনোদাদেবী নার্সিংহোমে যাওয়ার ভয়ে বারবারই বলেছে, 'না আমার এখন তত কষ্ট হচ্ছে না। এবার আমি কিছুতেই নার্সিংহোমে যাব না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন যদি আমি মারাও যাই তবে দুঃখ নেই। মরার আগে তোদের হাতের জল পেলেই আমার শান্তি।'

বিনোদাদেবী 'ভাল আছি' বললেও ভাল ছিলেন না। একদিন মাঝ রাতে বুকে ব্যথার সাথে খুবই শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। এত রাতে ছেলে, ছেলের বৌকে ডেকে বিরক্ত করবেন? তাই যতটা পারছিলেন সহ্য করছিলেন। কিন্তু ডাকতে হোল না। মার গোঙানির আওয়াজ পেয়েই অভীকের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।—শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না দেখে অভীক কিছুদিন মার ঘরে পাশের খাটে শুচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে মার খাটে উঠে দু-হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, 'মা কি হয়েছে? খুব কষ্ট হচ্ছে?' বিনোদাদেবীর তখন কথাটা

জড়িয়ে গেছে। বড় বড় হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। মনি দুটো একদিক-ওদিকে ঘুরিয়ে দেখছেন। যেন কাকে খোঁজার খুব চেষ্টা করছেন। অভীক তাড়াতাড়ি সুলেখাকে ডেকে তুলে মার কাছে বসিয়ে বলল, 'তুমি মার কাছে বস। আমার ঠিক ভাল মনে হচ্ছে না। আমি এখনই বেরুচ্ছি অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে একটা এ্যাম্বুলেন্স পাই কিনা দেখছি।'

সুলেখা ঘুমের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠে শাশুড়ীর কাছে এসে বসল। দু হাত দিয়ে বিনোদাদেবীর কাঁধে হাত দিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'মা—কি কষ্ট হচ্ছে?'

বিনোদাদেবীর কোন উত্তর দিলেন না। কি করবে সুলেখা ঠিক বুঝতে না পেরে একবার শাশুড়ীর মাথায়, একবার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে বুবাই দেখে মা বিছানায় নেই। ঘরের আলোগুলো সব জ্বলছে। পাশের ঘরে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে চার বছর বয়সে কি বুঝল তা কে জানে বিছানা থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে ঠাকুমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বুবাই দাঁড়াতে বিনোদাদেবী ঐ কষ্টের মধ্যেও একটা হাত তুলে বুবাই এর হাত ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাতটা একটু উঁচু হয়েই আবার পড়ে গেল। সুলেখা বুঝতে পারল এবার বোধ হয় মাকে আর বাঁচানো যাবে না। তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর আসন থেকে গঙ্গা জলের পাত্রটা নিয়ে এক চামচ গঙ্গাজল শাশুড়ীর মুখে নিজে ঢেলে দিল। আর এক চামচ বুবাই-এর হাতে ধরে ঢেলে দিল। বাইরে তখন সবে আলো দেখা দিচ্ছে। কাকের ডাক একটা দুটো শোনা যাচ্ছে। সুলেখা বার বার কান খাড়া করে নজর রাখছিল গেটে কোন আওয়াজ হয় কিনা। ভাবছিল অভীক কতক্ষণে এসে পৌছাবে। এমন সময় গাড়ীর আওয়াজ হতেই সুলেখা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। অক্সিজেন সিলেন্ডারের আর প্রয়োজন হোল না। চামচে একটু গঙ্গা জল ঢেলে সুলেখা তাড়াতাড়ি অভীকের হাতে দিয়ে বলল, 'দাও, গলায় এখনই ঢেলে দাও'। এ সবে, অভীকের বিশ্বাস নেই কোনদিনই। কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী মার বার বার ও-রকম মুখ হাঁ করা দেখে স্থির থাকতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মত জলটা গলায় ঢেলে দিল। যেন ঐ টুকুর জন্যেই বিনোদাদেবী বেঁচে ছিলেন। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল শ্বাস নেওয়া।

* * * * *

দেখতে দেখতে আরও তিন-চার বছর কেটে গেল। সুলেখার পি. এইচ. ডি.-টা কমপ্লিট হয়েছে। 'স্লেট' পরীক্ষা আবার দিয়েছিল। কিন্তু হয়নি। আসলে স্কুল মাষ্টারীটা পেয়ে গিয়েছিল বলে তার অত গরজ করে পড়ে নি। অভীক একটু বকাবকি করেছিল তবে বেশি কিছু বলে নি। ইতিমধ্যে বি. এড. টাও পড়ে নিয়েছে। রান্নার মাসি বিমলা এখনো আছে। তাছাড়া সবসময়ের জন্যে আর একটা লোক রেখে নিয়েছে। দুজনেই

কাজে বেরিয়ে যায়। বুবাই এখন স্কুলেও ভর্ত্তি হয়েছে। স্কুল বাসে তুলে দেওয়া আবার নামিয়ে আনা সবই সে করে। সব সে করলেও সুলেখা সবদিকেই নজর রাখে। আর কাজ করতেও তার ভাল লাগে। নিজের সংসারে নিজে দেখে শুনে ঠিক রাখবে না তো কে রাখবে? অভীকই বরং আজকাল কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। অবশ্য বরাবরই সে একটু গম্ভীর 'সিরিয়াস' প্রকৃতির। তবু আজকাল যেন বেশি 'গম্ভীর হয়ে' গেছে।

* * * * *

সুমন এখন ইতিহাস অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ে। অভীক যে রকম প্রতি শনিবার যায় সে রকমই যাচ্ছে। সুমনের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয় তবে কখন-ই নিজের মত চাপিয়ে দেয় না। স্কুল ফাইনালে ষ্টার' নিয়ে ভাল ভাবে পাশ করার পর সুমন জিজ্ঞেস করেছিল। 'সাইন্স না আর্টস পড়বে?' অভীক বলেছিল 'তোমার যেটাতে 'ন্যাক' আছে সেটাই পড়া ভাল। নিষ্ঠা থাকলে সায়েন্স কেন আর্টসেও প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। তবে একবার তোমার মার কাছে শুনে নিও।' মার ইচ্ছানুসারেই সুমন হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. ভর্ত্তি হয়েছে। তাছাড়া সুমনের নিজেরও ইতিহাসের উপরে একটা ঝোঁক ছিল বরাবর। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। তবে, মল্লিকার ইচ্ছে সুমনও পরবর্ত্তীকালে ডক্টরেট হয় সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক হোক। অথবা কমপিটেটিভ পরীক্ষা দিয়ে 'এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ' লাইনে কোন বড় পোষ্টে চাকরী করুক।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মল্লিকার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে। অভীকের পড়াতে আসার দিনে বিশেষ কোন কাজ না থাকলে আজকাল বাড়িতে থাকার চেষ্টা করে। অভীকের সাথে সব সময়েই যে একটা না একটা বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করে দিত, এখন আর তা ইচ্ছে করে না। তা বলে কথাবার্ত্তাও কিছু হয় না। যা দু'একটা হয় মামুলি কথাবার্ত্তা—যেমন সুমনকে পড়াতে পড়াতে কোন দিন হয়তো দেখছে অভীক বারবার হাঁচচে। রুমাল বের করে নাক মুছছে। তখন হয়তো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শরীরটা কি খারাপ।'

অভীক সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, 'না'। তারপর আর কথা এগোয় না। বিনোদাদেবী মারা যাবার পর জিজ্ঞেস করেছিল, 'মরার আগে তোমার মা কি কিছুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?'

অভীক উত্তর করল, 'না, তেমন কিছু নয়। তবে ইদানীং দু-তিন বছর শীতকালে সর্দিকাশির সাথে শ্বাসকষ্টের জন্যেও কষ্ট পেতেন।'

একদিন মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, 'সুলেখা স্কুল-মাস্টারী করছে তো?"

অভীক উত্তর দিল, 'হ্যাঁ'।

—'ঘরে কেউ নেই। বাচ্চা নিয়ে সংসার আর চাকরী সামলাতে অসুবিধে হচ্ছে না?'

—'হচ্ছে নিশ্চয়-ই। তবে অসুবিধে হলেও ও কোন 'গ্রামলিং' করে না। তবে আমিও যতটা পারি 'কোপারেট' করার চেষ্টা করি।'

মল্লিকা চুপ হয়ে যায়।

একদিন বৃষ্টির মধ্যে অভীক ভিজে ঘরে ঢুকলে মল্লিকা বলল, 'আমি নিজের জন্যে চা করছি। তুমি কি খাবে?'

অভীক উত্তর দেয়, 'আমি তো চা খাই না। তুমি হয়তো ভুলে গেছ।' অভীক চা কেন, কোন কিছুই, এমন কি জল পর্য্যন্ত মল্লিকার ওখানে খেতে চায় না।

মল্লিকা বোঝে, কিছু বলে না। আবার এক একদিন এমনও হয়েছে অভীক এসেছে, মল্লিকা বাড়িতেই আছে অথচ একটা কথাও হয় না।

অভীক প্রতি শনিবার মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়েই মল্লিকাদের ফ্ল্যাটে যায়। কলিং বেল বাজানোর শব্দ শুনেই সমুন বুঝতে পারে এটা বাবার বাজানো। চিৎকার করে বলে ওঠে, মা, বাবা এসেছে।' অন্য সময় কাজের মাসি সুধা দরজা খুলে দেয় কিন্তু এ সময় মল্লিকা নিজেই উঠে যায়। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। অভীক এক পলক মল্লিকার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকে যায়। জুতো রাখার নির্দিষ্ট জায়গায় জুতো রেখে সোজা সুমনের ঘরে চলে যায়। আবার যখন চলে যাওয়ার সময় হয় মল্লিকাই দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। অভীক নীরবে আগের মতনই মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়। কেউ-ই-কোন কথা বলে না। অভীক চলে যাওয়ার পরই মল্লিকার ভিতরে কেমন যেন একটা করতে থাকে। একটা রাগ, একটা দুঃখ, একটা অপমানবোধ তাকে যেন কুরে কুরে খায়। প্রতিজ্ঞা করে পরের দিন সে সুধাকে বলবে দরজাটা খুলে দিতে। কিন্তু বলতে গিয়েও বলে না। নিজেই খুলে দিতে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু পরক্ষণেই তীব্র যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কি যে কষ্ট তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। এক এক সময় অজান্তেই চোখের কোন দিয়ে দু এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সুমন দেখতে পেলে কাছে এসে বলে 'মা, তুমি কাঁদছ?"

মল্লিকা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি আঁচলের কোনা দিয়ে জলটা মুছে নিয়ে বলে, না অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। তাই বোধহয় হাওয়া লেগে জল গড়িয়ে আসছে।'

* * * * *

মল্লিকার সাথে 'এ্যাডযাষ্ট' না হলেও সুলেখার সাথে অভীকের বেশ ভালোই এ্যাডযাষ্ট হয়েছে। অভীকের বড় গুণ ও কখনও নিজের মতটাকে অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা করে না। আর সুলেখার বড় গুণ এই মর্যাদার অসদ্ব্যবহার কখনো করে না। পরস্পরের

এই বোঝাপড়ায় বেশ চলে যাচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে অভীক সংসারের সব দায়িত্বই সুলেখার হাতে তুলে দিয়েছিল। সুলেখাও বেশ হাসি মুখেই সব সামলাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য অনুযোগ করে বলত, 'বাড়ির কর্ত্তামশাই দেখছি সংসারের দায় দায়িত্ব সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে। এবার কি তিনি বৈরাগী হয়ে বেরবেন নাকি?'

অভীক হেসে বলত, 'ঝেড়ে, ফেলে কি গো? যোগ্য লোকের হাতে কাজের ভার দিয়ে এতদিনে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। আরে পুরানো প্রভাবটা ভুলে যাচ্ছ কেন?'—'সংসার সুখের হয়ে রমণীর গুণে।'

সুলেখা বলে ওঠে, 'আর, পুরুষ কাটাবে শুধু হেসে গান শুনে।' দুজনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে। সুলেখা বলে, 'তাহলে সংসার সুখের করতে পুরুষের কোন ভূমিকা নেই।?'

—'কেন?' সংসারের যাবতীয় বাইরের কাজগুলো তারা করবে। আর ভিতরের কাজগুলো করার জন্যে গৃহকর্ত্তীর হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। এই যেমন আমি তোমার আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে থাকি।'

—' কে তুমি?' সুলেখা হাসতে হাসতে বলে, 'তাহলেই হয়েছে।' কথাবার্ত্তাটা হাসি ঠাট্টার মধ্যেই শেষ হয়। এইভাবে দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। বুবাই-এর বয়স এখন আট। ক্লাস টু-তে পড়ে। একটা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলেই অভীক আর সুলেখা বুবাইকে ভর্ত্তি করেছে। ওদের দুজনেরই বিশ্বাস আজকাল যা হার্ড কমপিটিসনের যুগ, তাতে ইংরেজী জানা এবং বলতে পারা খুবই প্রয়োজন। পড়াশোনাতে বুবাই-এর বেশ আগ্রহও আছে। তবে অল্প বয়স, কিছুই বলা যায় না এখনই। মাঝে মাঝে কোথা থেকে কি যে সব শিখে এসে এমন সব প্রশ্ন করে, মনে হয় যেন কত এক বিজ্ঞ মানুষ।

অভীক আর সুলেখার বেশ কেটে যায় বুবাইকে নিয়ে। এভাবে ভালই চলছিল। কিন্তু বেশি দিন গেল না। হঠাৎ সুলেখার শরীরটা খুব খারাপ হয়ে এলো। কিছুদিন ধরেই অবশ্য অল্প অসুবিধে হচ্ছিল। পেট-টা ভার বোধ হোত। মাঝে মাঝে জ্বালা করত। প্রথম দিকে মনে করেছিল গ্যাস-অম্বলের জন্যে। অনেকেরই হয়ে থাকে। তাই " জেলুসিল-হজমিগুলি' খেয়ে সাময়িক কমে গেলে আর কোন গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু কিছুদিন বাদে তাতে আর কমছিল না। তখন অভীক একদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু প্রথমে ধরতে পারেন নি। বলেছিলেন এটা গ্যাসট্রিকের লক্ষণ বলে তার মনে হচ্ছে। কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন—আর সময় মত খাওয়া দাওয়া করতে বলেছিলেন। যাতে বেশিক্ষণ পেট খালি না থাকে। আর বলেছিলেন—যদি সম্ভব হয় তবে দেওঘর বা মধুপুরের দিকে কিছুদিন বেড়িয়ে আসলে ভাল হয়। ওখানকার জল হাওয়াটা পেটের পক্ষে বেশ ভাল।

অভীকের এক প্রাক্তন ছাত্রের দেওঘরে হোটেল ব্যবসা আছে। অভীক তার মাধ্যমেই একটা ঘর দিন পনেরোর জন্যে বুক করে নিল। বড় দিনের সাত দিন ছুটির সাথে অভীক

আর সুলেখা আরও কিছুদিন ছুটি নিল। বেশ আনন্দের সাথেই তিন জনে রওনা দিল পশ্চিমে ক'দিন কাটিয়ে আসবে বলে। দেওঘরে জল-হাওয়ায় সুলেখা একটু যেন সুস্থ বোধ করল। অভীকের সাথে গিয়ে বৈদ্যনাথের পুজো দিয়ে এলো একদিন। অভীক অবশ্য পূজো আচ্চাতে বিশ্বাস করে না। তবে যে বিশ্বাস করে তার বিশ্বাসকে আঘাত করতে চায় না। তাই প্রসাদী প্যাড়া যখন সুলেখা অভীকের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও খেয়ে ফেল', অভীক তা খেতে আপত্তি করে নি। একদিন সৎ সঙ্গের আশ্রমে আর একদিন ত্রিকূট পাহাড়েও তারা গেল। ত্রিকূট পাহাড়ের গাছ গাছালির মধ্যে দিয়ে তারা বেশ খানিকটা উঠেছিল। এক এক জায়গায় এক এক সব নাম রেখেছে—সুর সুরিয়া, গুড়গুড়িয়া, হামগুড়িয়া। হামাগুড়িয়া জায়গাটায় পাথরটা এমন ভাবে রয়েছে যেন কচ্ছপের পিঠ। একেবারে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ভয় ভয় করলেও বেশ আনন্দ হয়েছিল। বাকী কয়দিন বিশ্রাম নিয়ে তারা ভালভাবে কলকাতায় ফিরে এলো।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন বাদে আবার অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। বরং এবার আরও বেশি। পেটের ভিতরটা ভারবোধ তো হচ্ছেই তার সাথে এখন জ্বালা যন্ত্রণা প্রায় সব সময়েই থাকছে। চেহারাটা-ও দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একদিন হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় সুলেখা ভয় পেয়ে গেল। অভীককে জানাতেই অভীক কাল বিলম্ব না করে একজন বড় 'মেডিসিনের' ডাক্তারের কাছে সুলেখাকে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, এটা তার 'গ্যাসট্রিক' বলে মনে হচ্ছে না। একটা 'আলটা সোনোগ্রাফী' করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সার্জেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে বললেন। কথাটা শুনে সুলেখা যতটা না ভয় পেয়েছিল, অভীক ভয় পেয়ে গিয়েছিল তার থেকে বেশি। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। বাড়িতে এসে বরং অভীকই সুলেখাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'ভয় পেয় না। দেহ থাকলে অসুখ হয়। আবার চিকিৎসা করলে সেরেও যায়।'

কিন্তু সুলেখার অসুখ সারার নয়। আল্‌টা সোনোগ্রাফী করে ধরা পড়ল পেটে টিউমার হয়েছে। বায়োপসিও করা হলো। ধরা পড়েছে টিউমারটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। সেটা এত দ্রুত বড় হচ্ছে যে যে 'ইমেডিয়েট' অপারেশন না করলে নয়। আবার অপারেশন করেও রোগীর জীবন সম্পর্কে কোন গ্যারিন্টি দেওয়া যাবে না। অভীকের তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থা। কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না। ভগবানে সে বিশ্বাস করে না। তবু অবচেতন মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, 'ভগবান, দীর্ঘ টানা পোড়েনের পরে যদিও বা একটু সুখের মুখ দেখালে, তাও-ও কেড়ে নিচ্ছ?'

সুলেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে, স্পষ্টাস্পষ্টি অভীকের মুখ থেকে শোনার দরকার হয়নি কি রোগ হয়েছে তার। আন্দাজ করেই বুঝে নিয়েছে যে এটা ক্যান্সার!

বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে কলকাতায় অপারেশনটা না করিয়ে অভীক-সুলেখাকে নিয়ে

গেল বোম্বাই-এর টাটা ক্যান্সার সেন্টারে। অপারেশনের পর যাবতীয় ব্যবস্থায় সুলেখা একটু ভাল হয়ে উঠল। কিন্তু ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, 'এই ভাল অবস্থাটা বোধ হয় ছয় মাসও যাবে না।'

ঠিকই। পাঁচমাস সাড়েপাঁচ মাসের মাথায় সুলেখা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। অভীক একটুও দেরী না করে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে যাতে ভর্ত্তি করা যায় তার ব্যবস্থা করল। অভীকের ব্যস্ততা দেখে সুলেখা একদিন বলল, ' দেখ আমার যা রোগ এ তো সারার নয়। তবে আর কেন খরচ-পাতি করাবার দরকার আছে বল? চেষ্টা তো কম করনি। খরচও তো অনেক হয়ে গেল। তুমি পেরে উঠবে কি করে?' অভীক শুনে বলল, 'তুমি বলছ কি? তাই বলে তোমায় বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব?'

—মরতে তো চাই না। এই সোনার সংসার ফেলে কোন মেয়ে মরতে চায় বল? কি পাই নি আমি? মনের মতন স্বামী, পুত্র, সংসার। এমন কি একটা চাকরি পর্য্যন্ত। এসব ফেলে কোন মেয়ে কি মরতে চায় বল?

—'বার বার মরার কথা বলছ কেন? আমার বিশ্বাস তুমি এবারও সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবে।'

সুলেখা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কে জানে!'

* * * * *

এত ব্যস্ততার মধ্যেও অভীক প্রতি সপ্তাহেই সুমনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করত। বোম্বাই যাওয়ার সময় মাঝে দু এক সপ্তাহ যেতে পারে নি। ফিরে আসার পরে যে দিন গেল সেদিন অভীকের চোখে মুখে একটা চিন্তার ছাপ। বাবাকে দেখেই সুমন জিজ্ঞেস করল, "বাবা তুমি কি অসুস্থ? তোমাকে কেমন যেন লাগছে।'

অভীক সুলেখার অসুখের কথা কিছু বলতে চায় নি। বলেছিল, না, একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। তাই আসতে পারি নি।'

সুমন বলল, 'না, তার জন্যে নয়। তবে তোমার শরীরটা কিন্তু এ কয়দিনে খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

তখনকার মত কথাটা চাপা দিলেও বেশি দিন আর চাপা দিয়ে রাখতে পারে নি। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে সুলেখা ভর্ত্তি হলে একটা দুটো শনিবার আবার কামাই হয়ে গেল। সুমন কিছু জিজ্ঞেস করে নি। কিন্তু জিজ্ঞাসু চোখ দেখে অভীক নিজেই একদিন বলল, ' তোমার ছোট মা খুব অসুস্থ তাই সে বিষয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য এখানে ঠিক মতন

আসতে পারছি না। আমি না এলেও পড়াশোনা তুমি ঠিক মতন চালিয়ে যেও!'

সুমন জিজ্ঞেস করল, 'ছোট-মার কি হয়েছে?'

অভীক কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বলল, 'ক্যান্সার'?

কথাটা সুমনের কাছ থেকে মল্লিকার কানে গিয়েও পৌছাল। অভীকের কোন বিষয়েই মল্লিকার এখন আর কিছু আসে যায় না। তবু কিছুদিন ধরেই মল্লিকা লক্ষ্য করেছিল অভীক যেন আশ্চর্য্য রকমভাবে চুপ হয়ে গেছে। মুখে প্রায়ই খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বেশভূষায় কোনদিনই তার পরিপাটি ছিল না। তবু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। এখন তা-ও নেই। আগে সুমনকে পড়ার সময় কত কথা, কত গল্প করত। এখন শুধুই পড়াটা দেখিয়ে দেয়। তাতেও পড়াতে পড়াতে মন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। অভীককে দেখলে বোঝা যায় কোন একটা বিষয় সে গভীরভাবে চিন্তা করছে। মল্লিকা লক্ষ্য করেছিল ব্যাপারটা। একদিন ভেবেছিল অভীককে জিজ্ঞেস করবে, ' তোমার কি কোন অসুখ করেছে, আবার কি ভেবে জিজ্ঞেস করে নি। ভেবেছে জিজ্ঞেস করলে যদি অভীক উল্টে জিজ্ঞেস করে, 'আমার শারীরিক খোঁজ খবর নিয়ে তোমার কোন দরকার আছে?' —তাই কিছু বলে নি।

আবার মাঝে মাঝে ভেবেছে, দ্বিতীয় বৌ-এর সাথেও হয়তো মানিয়ে চলতে পারছে না। তাই মানসিক অশান্তিতে ভুগছে। বার বার ডাইভোর্স হলে লোক লজ্জাও আছে! আসলে পুরুষ জাতটার উপরেই মল্লিকার বিতৃষ্ণা। ওরা কখনই মহিলাদের দুঃখ বুঝতে চায় না। তাই এক একবার ভেবেছে, ভালই হয়েছে মানসিক যন্ত্রণায় কি করে কষ্ট পেতে হয় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াও দরকার।

কিন্তু সুলেখার ক্যান্সারের কথাটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এক অল্প বয়সী মেয়ে আশা নিয়ে সংসার করতে এসে অকালে ঝরে যাবে? অভীকের জন্যেও খারাপ লাগছিল। একবার সংসার পেতে শান্তি পেল না। দ্বিতীয়বার সংসার পেতে শান্তি আসতে না আসতেই বিচ্ছেদের ব্যাথা ঘনীভূত হয়ে উঠল।' মনে মনে ভাবল এমন অবস্থায় লোকে অপরিচিত লোককেও সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে এতদিনে একবারও অভীককে জিজ্ঞেস করে নি কিছু? ঠিক করল সামনের দিন আসলে নিশ্চয়ই অভীককে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু পারে নি। কি একটা বাধা তাকে আটকিয়ে দিয়েছে কিছু জিজ্ঞেস করতে। জিজ্ঞেস করতে, না পারলেও অভীক চলে যাওয়ার পরই এক অব্যক্ত ব্যথায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

* * * * *

চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তির পরে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি। কখনও চলছিল কেমোথেরাপি' কখনও 'রে' দিয়ে টিসুগুলো অকেজো করে দেওয়া। কিন্তু কোন

উন্নতি দেখা দিল না। সুলেখার শরীরটা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সুন্দর রঙটা একেবারে কালো হয়ে আসছিল। রোগা হতে হতে যেন শুধুই হাড় ক'খানা এসে ঠেকেছে। মাথার চুলগুলো উঠে টাক্ পড়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা তো ছিলই এর সাথে। 'ভিজিটার্স আওয়ারে' অভীক এসে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছ?'

সুলেখা কোন উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে অভীকের হাত দুটো ধরে মাথার কাছে বসিয়ে বলে, ' কেমন আছ আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। তার থেকে মাথার কাছে বসে আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। আর ক'দিনই বা বাঁচব?' বলতে বলতে সুলেখার দু'চোখের কোনা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অভীক হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এক সময় তুমি তো খুব শক্ত মনের মেয়ে ছিলে। এখন মনটাকে এত দুর্বল করে ফেলছ কেন? ডাক্তাররা তো আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমার বিশ্বাস তুমি এবারও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে। আরও অনেকদিন বাঁচবে।'

—'বাঁচতে তো চাই। চিকিৎসারও যে অবহেলা হচ্ছে তা-ও বলছি না। কিন্তু শরীরটা যে দিনকে দিন ভেঙ্গে পড়েছে। কষ্টের কোন লাঘব হচ্ছে না। আমার দিন বোধ হয় এখন হাতে গোনার মধ্যে। অথচ দেখ একজন মেয়ে মানুষ যা চায়, ভাল স্বামী, পেয়েছি। পুত্র পেয়েছি। নিজে হাতে সংসার করতে পেরেছি। এই বাজারে আমি একটা চাকরীও করছি। সংসারে কোন সমস্যা নেই। কোন অশান্তি নেই। এর থেকে বড় চাওয়া আর কি হতে পারে? অথচ ভগবানের কি বিচার? আর হয়তো বাড়ি ফিরে যাওয়া হবে না।'

—অভীক সুলেখার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁপিয়ে পরছ। তুমি বরং একটু চোখ বুজে শুয়ে থাক। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

—'চোখ তো আর ক'দিন বাদে আপনিই বুজে যাবে। কথাগুলো না বললে আমার ভিতরটা যে হাল্কা হবে না। এ টুকু বুজছ না কেন?'

অভীক কোন কথা না বলে চুপ করে থাকল।

সুলেখা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'বুবাই বড় ছোট। এই বয়সে মা মারা গেলে ওর যে কি হবে? তুমি-ই বা ওকে সামলে কি করে পারবে?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ বাদে বলল, 'আবার একটা না হয় বিয়ে করো। একটু-দেখো. সে যেন বুবাইকে দেখে।'

অভীক সুলেখাকে থামিয়ে বলল, 'কি আজে বাজে বকছ? আমি কথা দিচ্ছি, বুবাই-এর জন্যে আমি আপ্রাণ করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি বুবাইকে কোন দিন কষ্ট দেব না।'

—'আমি তা জানি। আমি নিশ্চিন্তই। তবু মায়ের মন?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। এক সময় ওয়ার্ডের মাসি 'ভিজিটিং আওয়ার্স' শেষ হওয়াতে ঘন্টা বাজিয়ে গেল। অভীক উঠি উঠি করেও উঠতে পারছিলো না। হঠাৎ সুলেখা অভীকের ডান হাতটা তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে কাতর দৃষ্টিতে অভীকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকাল। দুজনেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল নীরবে। কারও কোন কথা নেই। ওয়ার্ড মাসি বেডের কাছে এসে তাগাদা দিতেই দুজনের যেন সম্বিত ফিরে এলো। যাওয়ার মুখে সুলেখা অতিকষ্টে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি তো এখন আর উঠতে পারি না। তুমি একটা কাজ করবে?'

অভীক জিজ্ঞেস করল, 'কি বল?'

—'তোমার পায়ের একটু ধুলো আমার মাথায় ছুইয়ে দেবে? আর আশীর্ব্বাদ করে যাও, পরের জন্মে যেন তোমাকেই আবার স্বামী হিসাবে পাই।'

* * * * *

প্রায় সারাটা রাতই অভীকের জেগে কেটে গেল। বিছানায় শুয়েছিল। কিন্তু ঘুম আসছিল না। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়েই ফোনটা এলো। হাসপাতাল থেকে।—'সুলেখা শেষ রাতে হার্টফেল করে মারা গেছে। আপনারা হাসপাতালে চলে আসুন।'

এরকমই একটা সংবাদ একদিন না একদিন আসবে, এ আশঙ্কা ছিলই। তবে একেবারে যে পরের দিনই আসবে অভীক তা ভাবতে পারে নি। ফোনটা পাওয়ার পর দু'হাতে মুখটা চাপা দিয়ে সোফার উপরে বসে পড়ল অভীক।

* * * * *

সুলেখার অসুখটা বাড়াবাড়ি হওয়াতে অভীক পরপর দু-সপ্তাহ সুমনের কাছে যেতে পারে নি। ব্যস্ততার জন্যেও বটে আবার মনটাও খারাপ থাকায় ফোন করেও কিছু জানায় নি। সুমন প্রতিদিনই মল্লিকাকে বিরক্ত করে বলত, 'মা, ছোট মা এত অসুস্থ তুমি একদিন দেখতে যাবে না।'

মল্লিকা কথাটা এড়িয়ে যেত কোন উত্তর না দিয়ে। কিন্তু সুলেখার অসুখের এই বাড়াবাড়ি অবস্থার কথা শুনে মল্লিকার মনে সবসময়ই একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এই অস্থিরতা যে কিসের জন্যে তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না।

অভীকের কোন বিষয়েই তো এখন তার কিছু আসে যায় না। তবু কেন এই অস্থিরতা?

একথা ঠিক, যখন সে আলাদা হয় চলে আসে তখন মূলতঃ অভীকের উপরে—শুধু অভীক কেন, সমগ্র পুরুষ জাতের উপরে রাগ করেই সে চলে আসে। তারপর অভীক যখন সুলেখাকে বিয়ে করল, তখন তার সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল সুলেখার উপরে। অথচ সে মনকে বুঝিয়েছে,; সুলেখার তো কোন দোষ নেই। একটা শিক্ষিত রুচিশীল মেয়ে পারিপার্শ্বিক অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে উন্নত জীবন যাপনের যদি সুযোগ পায় তাতে তো তার রাগ হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে মল্লিকা চাকুরী ব্যাতিরেকে যে সামাজিক কর্মের সাথে যুক্ত তার প্রধান কাজই তো অবহেলিত নারীদের, নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা। তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার সাহয্য করা। তবু কি জানি কেন, বেশ কিছুদন মল্লিকা সুলেখাকে সহ্য করতে পারে নি। সহ্য করতে পারে নি মানে এই নয় যে সুলেখা ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ুক অকালে।

কয়েকবছর পরে ক্রমশঃ রাগটা থিতিয়ে এসেছিল। এক এক সময় সুলেখাকে বেশ ভাল লাগত। অল্প বয়সী মেয়েটা চাকরী করার সাথে দিব্যি কেমন স্বামী-পুত্র-শাশুড়ী নিয়ে সংসার করছে। অভীকের সাথে সমান তালে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অভীককে দেখলে মনে হোত ও বোধহয় এখন একটু শান্তি পেয়েছে।

সাংসারিক এই অবস্থায় সুলেখার মৃত্যু মানে আবার একটা অব্যবস্থায় চলে আসা। মল্লিকার কেন জানি মনে হোল অভীকের সাথে ওরও চেষ্টা করা উচিত যাতে সুলেখা বেঁচে যায়। কিন্তু মল্লিকা বেশ জানে, যদি অভীককে জানিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করে তবে সে নেবে না। তাই সে ঠিক করল অভীককে না জানিয়েই সে সুলেখার খোঁজখবর নেবে হাসপাতালে। ডাক্তারদের সাথে কথা বলবে। যতটুকু পারবে করবে। মল্লিকা ঠিক করল, ও বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে না গিয়ে দুপুর এগারটা সাড়ে এগারেটায় যখন রোগীকে ভাত দিতে যাওয়ার সময়। তখনই যাবে।

মাথায় কোন চিন্তা আসার পরে ফেলে রাখা মল্লিকার ধাতে সয় না। তাই পরদিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ মল্লিকা হাসপাতালে উপস্থিত হোল। সুলেখার সাথে দেখা করবে বলে। বাবার কাছে পড়ার সময় কথা প্রসঙ্গে সুমন জেনেছিল ছোট মা কোন হাসপাতালে কোন ওয়ার্ডে আছে। মল্লিকা সুমনের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে সোজাই চলে এলো সেই ওয়ার্ডে। বেডের কাছে এসে দেখে বেড খালি। বেডটা খালি দেখে মনে হোল বুকের ভিতর একটা ধাক্কা এসে লাগল। ওয়ার্ডের সিষ্টারকে জিজ্ঞেস করতে সিষ্টার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি সুলেখাদেবীর কে হোন?'

মল্লিকা বলল, 'আত্মীয়া।'

সিষ্টার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'উনি আজ খুব ভোরের দিকে মারা গেছেন। কিছুক্ষণ আগে ওর বাড়ির লোকেরা ডেড্‌বডি নিয়ে গেছে।'

মল্লিকা চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'মারা গেছে? ডেড্‌বডি কোথায় নিয়ে গেছে?—বাড়িতে না শশ্মানে বলতে পারেন?'

সিষ্টার উত্তর দিল, 'আপনি ওর আত্মীয়া বলছেন। আপনি জানেন না;—আমরা জানব?'

মল্লিকার হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলো; ভাবল ঠিকই। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কি করা যায় এখন। একবার ভাবল সোজা অভীকের বাড়িতে চলে যাবে। ডেডবডি নিশ্চয়ই বাড়ি ঘুরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে। পরক্ষণেই পা যেন এগুতে সংকোচ বোধ করতে লাগল। যেখান থেকে নিজে বেরিয়ে এসেছে, সেখানে আবার যাবে নিজেই? পা বাধা হয়ে দাঁড়ালেও মন বিদ্রোহ করল। অতি বড় শত্রুর কাছেও লোকে শোকে, দুঃখে বিপদে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়। সেখানে অভীক তো তাকে কোনদিন তাড়িয়ে দেয় নি। সে নিজেই চলে এসেছিল। তাই তারই উচিত নিজেই যাওয়া। এই ভাবতে ভাবতে একসময় মল্লিকা অভীকের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোল।

এত বছর বাদে আবার আসা! গেটের মুখে এসেও মল্লিকার কেমন ইতঃস্তত লাগছিল। ধীরে ধীরে গেট-টা খুলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। গেটের কাছে, দু-পাশের অল্প ফাঁকা জায়গাটায় সে তাকিয়ে দেখল। এক সময় কত ফুল গাছ সে লাগিয়েছিল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই। পুরো বাড়িটাই যেন খাঁ খাঁ করছে। কেউ আছে বলে মনেও হচ্ছে না। তবু মল্লিকা এগিয়ে গিয়ে কলিং বেলটায় চাপ দিল। সুলেখার শবদেহ নিয়ে অভীকরা কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে শ্মশানের উদ্দেশ্য। বাড়িতে রয়েছে শুধু বহুদিনের পুরানো রান্নার মাসি বিমলা। দরজা খুলে মল্লিকাকে দেখে বিমলা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, ' বৌদিমনি তুমি এসেছো? দাদাবাবু আমার আবার অনাথ হয়ে গেল!'

মল্লিকা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, 'অভীকরা এখন কোথায়?'

বিমলা বলল, 'একটু আগেই এখান থেকে বরানগর শ্মশানে-র উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছে। ছোট খোকা বাবুকেও নিয়ে গেছে। মুখাগ্নি তাকে করতে হবে যে। ভাবতে গেলেও বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে। এ বয়সেই মার মুখে তার আগুন দিতে হবে।'

মল্লিকা আর দেরী না করে রওনা দিল বরাহনগর শ্মশানের উদ্দেশ্য।

ফোনটা পাওয়ার পরে দু হাত দিয়ে মুখটা চেপে সোফার উপরে অভীক বসে রইল পাথরের মত। অনেকক্ষণ এই ভাবে বসে থাকতে দেখে কাজের মাসি অভীকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'দাদাবাবু ফোনটা পাওয়ার পর থেকে এ ভাবে বসে আছ, বৌদির

কোন খারাপ খবর নেই তো?'

অভীক মুখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না, ভগবান ওকে রোগ যন্ত্রণা থেকে আজই শেষ রাতে মুক্তি দিয়েছে।'

নিঃসন্তান বিধবা মাসি দীর্ঘদিন ধরে অভীকদের বাড়িতে কাজ করতে করতে নিজের লোকের মত হয়েছিল। অভীকের কথাটা শুনে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বলল, কি বললে? বৌদি মনি কি তাহলে আর নেই?'

অভীক কোন উত্তর দিল না।

মাসির চিৎকার করে কান্নার শব্দে বুবাই-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিছুদিন ধরে মা বাড়িতে নেই। তারপর ঘরে বাবাকেও না দেখে ভয় পেয়ে ও কেঁদে উঠল। বুবাই-এর কান্নার শব্দে অভীক তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে ওকে তুলে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বাবা, কাঁদছ কেন?'

কাঁদ কাঁদ স্বরে বুবাই বলল, 'ভয় করছে।'

—কিচ্ছু ভয় নেই। এই তো আমি। বলতে বলতে অভীক বুবাইকে কাঁধের উপরে ফলে বারান্দা দিয়ে পায়চারী করছিল। আর ভাবছিল এখন কি করা দরকার। বেশি হৈ চৈ করে লোক জড় করার সে পক্ষপাতী নয়। ভাবল সুলেখার বাপের বাড়িতে একটা খবর দিতে হবে। পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব পাঁচ-ছয় জনকে ফোন করে ও কথাটা বলবে। ওরা এসে পড়লেই হাসপাতাল থেকে সুলেখার বডিটা আনতে যাবে। প্রথমে একবার বাড়িতেই নিয়ে আসবে। বাড়ি অন্ত সুলেখার প্রাণ। বাড়ির সব কিছু খুঁটি-নাটি তার মুখস্থ। হাসপাতালের বেডে শুয়েও অভীককে বলে দিত কোন জিনিসটা কোথায় আছে। — 'এটা খুঁজে পাচ্ছ না? দেখবে ঐ তাকের, এই রং-এর কাপড়ের তলে আছে।' কতবার আক্ষেপ করে বলেছে , 'আর হয়তো আমার বাড়িতে ফিরে যাওয়া যাবে না।' অভীক প্রতিবার মুখে তাকে আশ্বাস জুগিয়েছে। আর মনে মনে করেছে হা হুতাশ! সেই মানুষটাকে জীবিত অবস্থায় আর না আনতে পারলেও মৃত অবস্থায় শেষ বারের মত একবার ঘুরিয়ে নেবে। তারপর বরাহনগর শ্মশানেই নেবে। বুবাই ছোট। ওকে শ্মশান্ পর্য্যন্ত টেনে নেওয়া অভীকের ইচ্ছে নয়। তবু নেবে। ওকে দিয়েই মুখাগ্নি করাবে। এসবে অভীকের বিশ্বাস নেই। তবে হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুলেখা অনেকবারই বলেছিল, 'যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।' এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি বুবাই-এর হাতের আগুনটা মুখে নিয়ে চলে যেতাম তবে বাঁচতাম। সে স্বর্গেই হোক বা নরকেই হোক' তাই অভীক কাজের মাসিকে বলল, 'দিদি, তুমি বুবাইকে কিছুক্ষণ বাদে খাইয়ে তৈরী করে রেখ। ওকে দিয়েই আমি মুখাগ্নি করাব। হাসপাতাল থেকে তোমার বৌদিমনির

দেহটা বাড়ি নিয়ে এসে বুবাইকে নিয়ে শ্মশানে যাব।'

শ্মশানে গিয়ে সবাই যখন পৌঁছাল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা যারা গিয়েছিল তারাই সব ব্যবস্থা করে দিল। ডেথ্ সার্টিফিকেট' জমা দেওয়া, টাকা দেওয়া, জিনিসপত্র জোগাড় করে আনা সবই। চুল্লিতেও ভীড়। তাই শবদেহটা লাইনে শুইয়ে রেখে এখন অপেক্ষা করে থাকা। অভীক বুবাইকে কোলে নিয়ে একটা চাতালে এসে বসল। কারও মুখে কোন কথা নেই। দৃষ্টি দূরে নিক্ষিপ্ত। গভীর চিন্তা মনে। মাঝে মাঝে এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ছে।

মল্লিকা অভীকের প্রায় সাথে সাথেই শ্মশানে এসে পৌঁছাল। এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখছিল। অভীক বুবাইকে নিয়ে চাতালে এসে বসলে ধীরে ধীরে অভীকের পাশে এসে বসল। অভীকের দৃষ্টি তখন দূরের দিকে। মল্লিকার পাশে এসে বসাটা লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ মল্লিকার কথায় চমকে উঠে পাশ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ও তুমি।'

মল্লিকা ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, ' বোম্বাই হাসপাতালে অপারেশনটা কি সাক্সেসফুল হয় নি?'

অভীক উত্তর করল, 'না, সাক্সেসফুলই তো হয়েছিল। তবে রোগটা অনেক পরে ধরা পড়েছে। প্রথম দিকে কিছু বোঝাই যায় নি। অপরেশান করে ওরা বলেই দিয়েছিল, কিছুদিনের মত ভাল থাকবে। তবে মাস ছয়েকের মধ্যে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। তখন বাঁচানো সংশয় হয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকার পর মল্লিকা আবার জিজ্ঞেস করল, এখন তাহলে কি করে চলবে?'

অভীক বলল,'অসুবিধে তো হবেই। বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকাতেই বড় কষ্ট হচ্ছে। অল্প বয়সেই মাতৃহারা হোল। বাবা না থাকলে ছেলে মেয়েরা তবুও মানুষ হয়। কিন্তু অল্প বয়সে মা মারা গেলে ছেলে-মেয়ে অধিকাংশ সময়েই নষ্ট, ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

মল্লিকা কোন উত্তর দিল না। তার পুরানো কথাগুলো মনে পড়ে গেল। অভীকের ঘর ছেড়ে মল্লিকা যখন চলে আসে তখন সুমনের বয়স এরকম সাত-আট বছরই ছিল। ডাইভোর্সের মামলার রায়ে সুমনের দাবী সুমনের ইচ্ছের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখনও অভীক বলেছিল—সুমনের দাবী সে করছে না। কারণ সুমন যাতে সত্যিকারেব মানুষ হয়ে ওঠে সেটাই সে চায়। মায়ের কাছে থাকলে বাচচা যতটা স্বাভাবিক বোধ করে বাবার কাছে ততটা নয়। মল্লিকার একবার মনে হোল সেও তো এই ফুলের মত বাচ্চাটার ভার নিতে পারে। সে তো অর্থনৈতিক দিক থেকে অক্ষম নয়। তা ছাড়া সুমনের সব খরচ তো অভীকই দিচ্ছে। বুবাই-এর সব খরচ সে দিক না। তারই যেন দু'টো ছেলে;

একথা তো মনে করতে পারে? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ও চাইলেই যে অভীক দেবে তার কি মানে আছে?

এতক্ষণে সুলেখার দাহ করার লাইন এসে গেল। পুরোহিত মশাইকে ডেকে আনতে হবে। মুখাগ্নির ব্যবস্থা করতে হবে। অভীক উঠে দাঁড়িয়ে বুবাইকে কার কোলে দেবে ভাবতেই মল্লিকা হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও আমি নিচ্ছি।'

মল্লিকা দু'হাত বাড়াতেই বুবাই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। মল্লিকা বুবাই-এর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমি তোমার বড়মা।'

বুবাই আধো আধো স্বরে বলল, "বড়মা! মা বলেছিল আমার একটা বড় মা আছে। একটা দাদা আছে।'

মল্লিকা বলল, 'হ্যাঁ, আছেই তো। তুমি যাবে দাদার কাছে?'

বুবাই বলল, 'হ্যাঁ যাব। মা হাসপাতালে গেছে। ফিরে এলে তার সাথে যাব।'

বুবাই-এর কথা শুনে মল্লিকার চোখে জল এসে গেল। এই ছোট ছেলেকে দিয়ে একটু পরেই তার মায়ের মুখে কি করে আগুন ছোঁয়ানো হবে। কিন্তু অভীকের জেদ,— বাস্তবকে মেনে নেওয়াটাই সব থেকে ভাল। সৎকারের ব্যবস্থা সব হয়ে গেলে মল্লিকার কোল থেকে অভীক বুবাই কে নিয়ে এগিয়ে গেল।

ওকে কোলে নিয়েই অভীক সুলেখার নশ্বর দেহটা প্রদক্ষিণ করে মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। পুরোহিত মশাই জ্বলন্ত এক গুচ্ছ পাট-কাঠি অভীকের হাতে ধরিয়ে দিলেন। মন্ত্র পড়তে পড়তে নির্দেশ দিলেন সুলেখার মুখে ছুঁইয়ে দিতে। অভীক বুবাইকে নিয়ে ঝুঁকে ছুঁইয়ে দিতেই বুবাই বলে উঠল "বাবা, মার মুখটায় আগুন দিচ্ছ কেন? জ্বালা করবে না?'

বুবাই-এর কথা শুনে অভীকের চোখ ফেটে জল এসে গেল। তাড়াতাড়ি ওর মুখটা ঘুরিয়ে কাঁধের উপরে নিয়ে নিল।

দেহটা ততক্ষণে বৈদ্যুতিক চুল্লির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

লেলিহান আগুনের বিরাট গহ্বরের মধ্যে ঢুকে গেল সুলেখার নশ্বর দেহ। কিছুক্ষণ বাদে তাই-ই এক মুঠি-ভস্মে পরিণত হয়ে বেরিয়ে এলো। অভীক যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিল ভস্মের উপর। অদাহ্য নাভি খণ্ড বিসর্জন দিয়ে এলো গঙ্গায়। এবার ফিরে যাওয়ার পালা। কিন্তু অভীকের এখনই বাড়ি ফিরে যেতে মন চাইল না। সাথে আসা প্রতিবেশী আর বন্ধুদের বিদায় দিয়ে সে বলল, 'এবার কিছুক্ষণ একাকী এই মহাশ্মশানে একটু বসে থাকতে চাই।" ইতস্ততঃ করলেও অভীকের একান্ত অনুরোধে সবাই চলে যেতে বাধ্য হলো। কিন্তু মল্লিকা গেল না। অভীক ধীরে ধীরে বুবাইকে কোলে নিয়ে গঙ্গার

পাড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসল। প্রসারিত গঙ্গা সামনে দিয়ে বহে চলেছে। আর অভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। সময় গড়িয়ে চলছিল আপন মনে। ধীরে ধীরে দিনের সূর্য্য গঙ্গাবক্ষে ডুবে গেল। চারিদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসতে মল্লিকা অভীকের কাঁধে একটা হাত দিয়ে বলল, 'এবার বাড়ি চল।'

অভীকও উঠবে উঠবে ভাবছিল, ছোট্ট ছেলে বুবাই কিছুক্ষণ ধরে উস্‌খুস্‌ করছিল আর বসতে চাইছিল না। বুবাইকে কোলে নিয়ে অভীক উঠে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মল্লিকার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার আসি।' মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। আমিও যাব।'

অভীক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

—'বাড়িতে। তোমার সাথে।'

—'আমার সাথে? সে তো অতীত? তোমার সাথে তো'—

কথাটার রেশ টেনে মল্লিকা বলে উঠল 'ডাইভোর্স' হয়ে গেছে।—সে কোর্টের রায়ে কাগজে কলামে। আমি এখন আর তা মানি না। সুলেখার সিঁথি থেকে আমি একটু সিঁদুর নিয়ে রেখেছি। তুমি সেটাই আমার সিঁথিতে এখন ছুঁইয়ে দাও।'